রামের সুমতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রামের সুমতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইউনিভার্সেল পাবলিকেশান্স লিঃ
২৫/১ এন. বি. ষ্ট্রিট লাহোর

নূতন পাকিস্তানী মুদ্রণ—১৯৬৫

প্রকাশক ঃ—
আজাদ জিলানী
ইউনিভার্সেল পাবলিকেশান্স লিঃ
২৫/৯ এন. বি. ষ্ট্রিট, লাহোর

মুদ্রণে ঃ
মির্জা গাইউর
ইউনিক প্রেস,
২৮, ওবায়দুল্লাহ্ রোড, লাহোর.

।। মূল্য—এক টাকাপঁচিশ পয়সা মাত্র ।।

॥ ১ ॥

রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন্ কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে দেখা দিবে সে কাহারও অনুমান করিবার যো ছি না। তাহার বৈমাত্র বড়ভাই শ্যামলালকেও ঠিক শান্ত-প্রকৃতির লোক বলা চলে না, কিন্তু সে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড করিত না। গ্রামের জমিদারী কাছারীতে সে কাজ করিত এবং নিজের জমিজমা তদারক করিত। তাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। পুকুর, বাগান, ধানজমি, দু-দশ ঘর বাগ্দী প্রজা এবং কিছু নগদ টাকাও ছিল। শ্যামলালের পত্নী নারায়ণী যেবার প্রথম ঘর করিতে আসেন—সে আজ তের বছরের কথা—সে বছরে রামের বিধবা জননীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি আড়াই বছরের শিশু রাম এবং এই সমস্ত সংসারটা তাঁহার তের বছরের বালিকা পুত্রবধূ নারায়ণীর হাতে তুলিয়া দিয়া যান।

এ বৎসর চারিদিকে অত্যন্ত জ্বর হইতেছিল। নারায়ণীও জ্বরে পড়িলেন। তিন-চারিটা গ্রামের মধ্যে একমাত্র খানিকটা পাশকরা ডাক্তার নীলমণি সরকারের এক টাকা ভিজিট দু'টাকায় চড়িয়া গেল এবং তাঁহার কুইনিনের পুরিয়া, আরারুট-ময়দা সহযোগে সুখাদ্য হইয়া উঠিল। সাতদিন কাটিয়া গেল, নারায়ণীর জ্বর ছাড়ে না। শ্যামলাল চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

বাড়ীর দাসী নৃত্যকালী ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ তাঁকে ভিন্ গাঁয়ে যেতে হবে— সেখানে চার টাকা ভিজিট—আসতে পারবেন না।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমিও না হয় চার টাকাই দেব, টাকা আগে না প্রাণ আগে? যা তুই, চামারটাকে ডেকে আন গে।

নারায়ণী ঘরের ভিতর হইতে সে কথা শুনিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, ওগো, কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ। ডাক্তার না হয় কালই আসবে, একদিনে আর কি ক্ষতি হবে?

রামলাল উঠানের একধারে পেরা-তলায় বসিয়া পাখীর খাঁচা তৈরি করিতেছিল, উঠিয়া আসিয়া বলিল, তুই থাক্ নেত্য, আমি যাচ্ছি।

দেবরটির সাড়া পাইয়া উদ্বেগে নারায়ণী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, ওগো, রামকে মানা কর। ও রাম, মাথা খাস্, আমার যাস্‌নে— লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ছি দাদা, ঝগড়া করতে নেই।

রাম কর্ণপাত করিল না—বাহির হইয়া গেল। পাঁচ বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র তখনও কাঠিগুলা ধরিয়া বসিয়াছিল, কহিল, খাঁচা বুন্‌বে না কাকা?

বুন্‌বো অখন, বলিয়া চলিয়া গেল।

নারায়ণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেন তুমি ওকে যেতে দিলে,? দেখ, কি কাণ্ড বা ক'রে আসে।

শ্যামলাল ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াই ছিলেন, রাগিয়া বলিলেন, আমি কি করব? তোমার মানা শুনলে না আমার মানা শুনবে?

হাত ধরলে না কেন? ও হতভাগার জন্যে আমার একদণ্ডও যদি বাঁচতে ইচ্ছে করে। নেত্য, লক্ষ্মী মা আমার, দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে

—ভোলাকে পাঠিয়ে দে গে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুক—সে হয়ত এখনও গরু নিয়ে মাঠে যায়নি।

নৃত্যকালী ভোলার সন্ধানে গেল।

রাম নীলমণি ডাক্তারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন ডিস্‌পেন্‌সারিতে, অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা আলমারির সামনে একটা ভাঙ্গা টেবিলে বসিয়া নিক্তি হাতে ঔষধ ওজন করিতেছিলেন। চারি-পাঁচ জন রোগী হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ডাক্তার আড়-চোখে চাহিয়া নিজের কাজে মন দিলেন।

রাম মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদির জ্বর সারে না কেন?

ডাক্তার নিক্তিতে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, আমি কি কর্‌ব—ঔষধ দিচ্ছি—

ছাই দিচ্ছ! পচা ময়দার গুঁড়োতে অসুখ ভাল হয়!

কথা শুনিয়া নীলমণি ওজন নিক্তি সব ভুলিয়া চোখ রাঙা করিয়া বাক্যশূন্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। এতবড় শক্ত কথা মুখে আনিবার স্পর্ধা যে সংসারের কোন মানুষের থাকিতে পারে, তিনি তাহা জানিতেন না।

ক্ষণেক পরে গর্জিয়া উঠিলেন, পচা ময়দার গুঁড়ো তবে নিতে আসিস্ কেন রে? তোর দাদা পায়ে ধ'রে ডাকতে পাঠায় কেন রে?

রাম বলিল, এদিকে ডাক্তার নেই তাই ডাকতে পাঠায়। থাক্‌লে পাঠাত না।

লোকগুলো স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছিল, তাহাদিগের পানে চাহিয়া দেখিয়া সে পুনর্বার বলিল, তুমি ইতর, বামুনের মানমর্যাদা জান না, তাই ব'লে ফেললে, পায়ে ধ'রে ডাকতে পাঠায়! দাদা কারো পায়ে ধরে না। আসবার সময় বৌদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে,

নইলে দাঁতগুলো তোমার সন্থই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি ক'রো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সাম্‌নে কলমের আমবাগান ক'রেচ, বেশী বড় হয় নি ত—ও কুড়ুলের এক এক ঘায়েই কাত হবে— ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাক্‌বে না। কাল এসে শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো ক'রে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বৃদ্ধ তখন সাহস করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আর বিলম্ব করো না। ভাল ওষুধ লুকানো-টুকানো যা আছে, তাই নিয়ে যাও। ও রাম ঠাকুর—যা বলে গেছে তা ফলাবে তবে ছাড়বে।

ডাক্তার নিক্তি রাখিয়া বলিল, আমি থানার দারোগার কাছে যাব, তোমারা সব সাক্ষী।

যে বৃদ্ধ পরামর্শ দিতেছিল, সে বলিল, সাক্ষী! সাক্ষী কে দেবে বাবু? আমার ত কুইনাইন খেয়ে কান ভোঁ ভোঁ করতেছে—রাম ঠাকুর কি যে ব'লে গেল, তা শুনতেও পেলুম না। আর দারোগা করবে কি বাবু? ও দেবতাটি দেখতে ছোট, কিন্তু ওনার ছোকরার দলটি ছোট নয়। ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলে থানার লোক দেখ্‌তে আসবে না, দারোগাবাবু এক আঁটি খড় দিয়ে উপকার কর্‌বে না! ও সব আমরা পারব না—ওনাকে সবাই ডরায়! তার চেয়ে যা ব'লে গেছে, তাই কর গে। একবার হাতটা দেখ দেখি আপনি —আজ দুখানা রুটি টুটি খাব নাকি?

ডাক্তার অন্তরে পুড়িতেছিলেন, বুড়ার হাত দেখিবার প্রস্তাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন—সাক্ষী দিবি নে তোরা তবে দূর হ' এখান থেকে? আমি কারুর হাত দেখতে পারবনা—মরে গেলেও কাউকে ওষুধ দেব না—দেখি, তোদের কি গতি হয়?

বৃদ্ধ লাঠিটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িল—দোষ কারো নয় ডাক্তারবাবু, উনি বড় শয়তান। ঠাকুরকে খবরটা একবার দিয়েই যেতে হবে, না হ'লে হয়ত বা মনে করবে, থানায় যাবার মতলব আমরা দিয়েছি। বিঘেটাক বেগুন-চারা লাগিয়েছি—বেশ ডাগর হয়েও উঠেছে—হয়ত আজ রাত্তিরেই সমস্ত উপ্‌ড়ে রেখে যাবে। ছোঁড়াগুলো ত রাত্রে ঘুমোয় না। বাবু, থানায় না হয় আর একদিন যেয়ো—আজ এক শিশি ওষুধ নিয়ে ওনারে ঠাণ্ডা ক'রে এসো।

বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর যাহারা ছিল, তাহারাও সরিয়া পড়িতে লাগিল। নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মানবজীবনের শেষ অভিজ্ঞতা—সংসারের সর্বোত্তম জ্ঞানর বাক্যটি আবৃত্তি করিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন—দুনিয়ার কারও ভাল করতে নেই।

নারায়ণী বাহিরের দিকের জানালায় চোখ রাখিয়া ছট্‌ফট করিতেছিলেন। রাম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, গোবিন্দ খাঁচা ধরবি আয়।

নারায়ণী ডাকিলেন, ও রাম, এ-দিকে আয়।

রাম কঞ্চির মধ্যে সাবধানে কাঠি পরাইতে পরাইতে বলিল, এখন না, কাজ কচ্চি।

নারায়ণী ধমক দিয়া বলিলেন, আয় বলচি শীগগির।

রাম কাঠিগুলো নামাইয়া রাখিয়া বৌদির ঘরে গিয়া তক্তপোষের একধারে পায়ের কাছে বসিল। নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে তোর দেখা হ'ল ?

হ্যাঁ।

কি বল্‌লি তাঁকে ?

আস্‌তে বল্‌লুম।

নারায়ণী বিশ্বাস করিলেন না—শুধু আস্‌তে বল্‌লি—আর কিছু বলিস্‌নি ?

রাম চুপ করিয়া রহিল।

নারায়ণী বলিলেন, বল্ না কি বলেছিস্ তাঁকে ?

বলব না।

নৃত্যকালী ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল—ডাক্তারবাবু আসচেন। নারায়ণী মোটা চাদরটা টানিয়া লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। রাম ছুটিয়া পলাইয়া গেল। অনতিকাল পরেই ডাক্তার লইয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৌমা, জ্বর সারা না সারা কি ডাক্তারের হাত ? তোমার দেওরটি ত আমাকে দুটি দিনের সময় দিয়েছে। এর মাধ্যে সারে ভাল, না সারে ত আমার ঘরে-দোরে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নারায়ণী লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিলেন, ওর ঐ রকম কথা, আপনি ভয় করবেন না।

ডাক্তার বলিলেন, লোকে বলে ওর একটি দল আছে, তাদের যে কথা, সেই কাজ। তাতেই বড় শঙ্কা হয় মা ! আমরা ওষুধ দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারিনে।

নারায়ণী চুপ করিয়া বলিলেন, ও ছোড়া একদিন জেলে যাবে; তা জানি, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়, তাই ভাবি।

আজ নীলমণি শোবার ঘরের সিন্দুক খুলিয়া আসল কুইনিন এবং টাটকা ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া ফিরিবার সময় শ্যামলাল চার টাকা ভিজিট দিতে গেলে তিনি জিভ কাটিয়া বলিলেন, সর্বনাশ ! আমার ভিজিট ত এক টাকা তার বেশী আমি কোন মতেই নিতে পারব না—ও অভ্যাস আমার নেই। শ্যামবাবু, টাকা দুদিনের, কিন্তু ধর্মটা যে চিরদিনের।

দুইদিন পূর্বে এইখানেই এক টাকার অধিক আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, আজ সে কথাও তিনি বিস্মৃত হইলেন, কিন্তু শ্যামলাল সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। যাহা হোক নারায়ণী আরোগ্য হইয়া উঠিলেন, এবং সংসার আবার পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

॥ ২ ॥

মাস দুই পরে একদিন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া পূর্ণ কলস নামাইয়া রাখিয়াই বলিলেন, নেত্য, সে বাঁদরটা কোথায়? বাঁদরটা যে কে, বাটীর সকলেই জানিত।

নেত্য বলিল, ছোট বাবু এই ত ছিল—ঐ যে ওখানে ঘুড়ি তৈরী কচ্চে।

নারায়ণী দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, ইদিকে আয়, হতভাগা, ইদিকে আয়। তোর জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব?

রামলাল আধখানা বেলের ভিতর হইতে কাঠি দিয়া খুঁচাইয়া আঠা বাহির করিতে করিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নারায়ণী বলিলেন, সাঁতরাদের একমাচা শসা গাছ কেটে দিয়ে এসেছিস্, কেন?

তারা আমাকে কাটতে দেখেছে?

তারা দেখিনি, আমি দেখিছি। কেন কেটেছিস্, বল?

আমাকে তারা অপমান করলে কেন?

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, অপমানের কথা পরে হবে—তুই চুরী কচ্ছিলি কেন, তাই আগে বল্?

রামলাল রীতিমত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, চুরি করছিলুম? কখ্‌খন না। এতটুকু শসা নিলে চুরি করা হয়?

নারায়ণী আরো জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাঁদর! একশবার হয়। বুড়ো ধড়ি, কাকে চুরি করা বলে, ঐ কচি ছেলেটাও জানে। দাঁড়িয়ে থাক্ এক পায়ে পাজি, দাঁড়া বল্‌চি।

এ বাড়ীতে কচি খোকা গোবিন্দ ছিল রামের বাহন। চব্বিশ ঘণ্টাই সে কাছে থাকিত এবং সব কাজে সাহায্য করিত। রামের হুকুম মত এতক্ষণ সে ঘুড়ি ধরিয়া ছিল, গোলমাল শুনিয়া সেটা ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চট্ করিয়া বলিল; কাকা, দাঁড়াও এক পায়ে—এমন ক'রে। বলিয়া সে একটা পা তুলিয়া প্রণালীটা দেখাইতেছিল—

রাম ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া এক পায়ে দাঁড়াইল।

নারায়ণী হাসী চাপিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সে তেমনি করিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া কোঁচার খুঁট দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে।

নারায়ণী বলিলেন, আচ্ছা যা হয়েছে। আর এমন করিস্ নে।

রাম সে কথা শুনিল না। রাগ করিয়া তেমনিভাবে এক পায়ে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নারায়ণী কাছে আসিয়া তাহার বাহু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, সে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া প্রবল বেগে ঝাড়া দিয়া তাঁহার হাত সরাইয়া দিল, তিনি হাসিয়া আর একবার টানিবার চেষ্টা করিতেই, সে পূর্ব্বের মত সবেগে ঝাড়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া এক দৌড়ে পলাইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে নৃত্যকালী ডাকিতে আসিয়া দেখিল চণ্ডীমণ্ডপের ও ধারের বারান্দায় পা ঝুলাইয়া খুঁটি ঠেস দিয়া রাম চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

নৃত্যকালী বলিল, ইস্কুলের সময় হয়নি ছোটবাবু! মা ডাকচেন! রাম জবাব দিল না। যেন শুনিতেই পায় নাই, এইভাবে বসিয়া রহিল।

নৃত্য সামনে আসিয়া বলিল, মা চান ক'রে খেয়ে নিতে বল্‌চেন।

রাম চোখ রাঙাইয়া গর্জিয়া উঠিল, তুই দূর হ!

কিন্তু মা কি বলেচেন শুন্‌তে পেয়েচে?

না, পাইনি! আমি নাব না, খাব না—কিছু করব না—তুই যা।

আমি গিয়ে বলচি তাঁকে, বলিয়া নৃত্যকালী ফিরিতে উদ্যত হইল।

রাম তৎক্ষণাৎ উঠিয়া খিড়কির এঁদো-পুকুরে ডুব দিয়া আসিয়া ভিজা মাথায় ভিজা কাপড়ে বসিয়া রহিল। নারায়ণী খবর পাইয়া ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন—ওরে ও ভূত, ও কি করলি? ও ডোবাটায় ভয়ে কেউ পা ধোয় না, তুই স্বচ্ছন্দে ডুব দিয়ে এলি?

তিনি আঁচল দিয়া বেশ করিয়া তাহার মাথা মুছাইয়া দিয়া কাপড় ছাড়াইয়া ঘরে আসিয়া ভাত বাড়িয়া দিলেন। রাম বাড়া-ভাতের সুমুখে গোঁজ হইয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী তাহার ভাবটা বুঝিয়া কাছে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী ভাইটি, এ-বেলা তুই আপনি খা, রাত্তিরে তখন আমি খাইয়ে দেব। চেয়ে দেখ, এখনো আমার রান্না হয়নি—লক্ষ্মীটি খাও।

রাম তখন ভাত খাইয়া জামা পরিয়া ইস্কুলে চলিয়া গেল।

নৃত্যকালী কহিল, তোমার জন্যই ওর সব রকম বদ্ অভ্যাস হচ্ছে মা! অত বড় ছেলেকে লোকে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া কি! একটু রাগ করলেই খাইয়ে দিতে হবে—ও আবার কি কথা!

নারায়ণী একটু হাসিয়া বলিলেন, না হ'লে খায় না যে। রাত্তিরের লোভ না দেখালে ও ঐখানে এবেলা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাকত—খেত না।

নৃত্যকালী বলিল, না, খেত না। ক্ষিদে পেলে আপনি খেত। অতবড় ছেলে—

নারায়ণী মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোরা ওর বয়সই দেখিস্! বড় হ'লে বুদ্ধি হলে পর আপনিই লজ্জা হবে। তখন আর কোলে বস্‌তে চাইবে, না খাইয়ে দিতে বল্‌বে?

নৃত্যকালী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল' ভালর জন্যই বলি মা, নইলে আমার দরকার কি? বার-তের বছর বয়সে যদি ওর জ্ঞান বুদ্ধি না হয়, তবে হবে কবে?

নারারণী এবার রাগ করিলেন। বলিলেন, জ্ঞান বুদ্ধি সকল মানুষের এক সময়ে হয় না, নেত্য। কারো বা দু'বছর আগে কারো বা দু'বছর পরে হয়। আর হোক্ ভাল, না হোক ভাল, তোদেরই বা এত দুর্ভাবনা কেন?

নৃত্য বলিল, ঐ তোমার দোষ মা। ও যে কি রকম দুষ্টু হয়ে উঠছে তা ত' নিজেই দেখতে পাচ্ছ! পাড়ার লোকে বলে তোমার আদরেই ও—

নারায়ণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন, পাড়ার লোক আদরটাই দেখে, শাসনটা দেখে না; কিন্তু তুই ত পাড়ার লোক ন'স, সমস্ত সকাল বেলাটা যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদল, পচা পুকুরে ডুব দিয়ে এল, ভগবান জানেন, জর হবে না কি হবে তার পরে কি বলিস উপোস্

করিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে? ঘরে-বাইরে আমার অত গঞ্জনা সহ্য হয় না, নেত্য। বলিতে বলিতে তাঁহার স্বর রুদ্ধ হইয়া চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন। এই কথা লইয়া কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গেও যে সামান্য কলহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা নেত্য জানিত না। অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া সে বলিল, ও কি মা, কাঁদ কেন? মন্দ কথা ত আমি কিছু বলিনি। লোকে বলে, তাই একটু সাবধান ক'রে দেওয়া।

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, সকল মানুষকে ভগবান এক রকম গড়েন না। ও একটু দুষ্ট বলেই আমি যার তার কথা চুপ ক'রে সহ্য করি, কিন্তু আদর দেবার খোঁটা লোকে দেয় কি করে? তারা কি চায়, ওকে আমি কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি? তা হ'লেই বোধ করি তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বলিয়া কোনরূপ উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

নৃত্যকালী এতটুকু হইয়া গিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, জানি না বাপু। সব বিষয়ে যে মানুষের এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য, সে কেন এতটুকু কথা বুঝতে পারে না? আর শাসন ত ভারী। ছেলে এক মিনিট এক পায়ে দাঁড়িয়ে কেঁদেছে ত পৃথিবী রসাতলে গেছে।

দাদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে রাম একেবারে পছন্দ করিত না। আজ রাত্রে ইচ্ছা করিয়াই নারায়ণী দুই ভাইয়ের খাবার পাশাপাশি দিয়া অদূরে বসিয়াছিলেন। রাম ঘরে ঢুকিয়াই লাফাইয়া উঠিল। যাও আমি খাব না—কিছুতেই খাব না।

নারায়ণী বলিলেন, তবে শুগে যা। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রামের লাফানি বন্ধ হইল, কিন্তু সে খাইতে বসিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রান্নাঘরের আর একটা দরজা দিয়া শ্যামলাল ঘরে ঢুকিতেই রাম ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। শ্যামলাল ধীরে সুস্থে খাইতে বসিয়া বলিলেন, রামা খেল না যে?

নারায়ণী সংক্ষেপে বলিলেন, ও আমার সঙ্গে খাবে।

আহার শেষ করিয়া শ্যামলাল চলিয়া যাইবামাত্র রাম এক মুঠা ছাই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি কউকে খেতে দেব না—সকলের পাতে ছাই দেব—দিই?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, দিয়ে একবার মজা দেখ না!

রাম ছাই-মুঠা হাতে করিয়া স্বুর বদ্‌লাইয়া বলিল, ভারি মজা সকালবেলা আমাকে ঠকিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়ে এখন মজা দেখ না!

তুই খেলিনে কেন?

তুমি যে বল্‌লে রাত্তিরে—

বুড়ো খোকা, পরের হাতে খেতে লজ্জা করে না?

রাম আশ্চার্য হইয়া বলিল, পরের হাতে কোথায়? তুমি যে বল্‌লে!

নারায়ণী আর তর্ক না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, যা —ছাই ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে আয়, কিন্তু আর কোন দিন খেতে চাস্‌!

খাওয়ান তখনো শেষ হয় নাই, নৃত্যকালি বিনা প্রয়োজনে একবার দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ও-দিকের বারান্দায় চলিয়া গেল।

নারায়ণী দেখিয়া বলিলেন, রাম, কখনও কি একটু শা ও ভাই! ভগবান কোন দিন কি তোর একটু সুমতি দেবে লোকের কথা যে আমি আর সহ্য করতে পারিনে!

রাম মুখের ভাত গিলিয়া লইয়া বলিল, কে লোক, তার নাম বল।

নারায়ণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ব্যস! কে লোক, ওকে তার নাম বলে দাও।

কিন্তু মাস-কয়েক পরে সত্যই নারায়ণীর অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার বিধবা মা দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধনীকে লইয়া এতদিন কোনমতে তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতে দিন কাটাইতেছিলেন। হঠাৎ সেই ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। নারায়ণী স্বামীকে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিলেন এবং আসিয়াই দিগম্বরী মেয়েকে ত ডিঙাইয়া গেলেনই, সেই সুবাদে রামকেও ডিঙাইবার জন্য পা বাড়াইতে লাগিলেন। প্রথম হইতেই তিনি রামকে বিদ্বেষের চোখে দেখিতে লাগিলেন।

আজ সকাল-বেলা রাম দুই-তিন হাত লম্বা একটা অশ্বত্থ-চারা আনিয়া উঠানের মাঝখানে পুঁতিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া দিগম্বরী মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, ওটা কি হচ্ছে রাম?

রাম তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, অশ্বত্থ গাছটা বড় হ'লে বেশ ছায়া হবে গো! মাষ্টারমশাই ব'লেছেন অশ্বত্থের ছায়া খুব ভাল। গোবিন্দ, যা, ঘটি ক'রে জল নিয়ে আয়। ভোলা, মোটা দেখে বাঁশ কেটে আন্—বেড়া দিতে হবে। নইলে গরু-বাছুরে খেয়ে ফেলবে।

দিগম্বরী হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ! এমন ছিষ্টি-ছাড়া কাণ্ড কখনও বাপের বয়সে দেখিনি বাবা!

রাম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না।

গোবিন্দ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী একটি ছোট ঘটি করিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। রাম হাত হইতে ঘটিটি লইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলিল, এটুকু জলে কি হবে রে পাগলা! তুই বরং দাঁড়া এখানে, আমি জল আনি গে।

তাহার পর ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া সমস্ত উঠানটা কাদা করিয়া রাম যখন গাছ-পোঁতা শেষ করিয়াছে, তখন নারায়ণী নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দিগম্বরী এতক্ষণ তুষের আগুনে দগ্ধ হইতেছিলেন কারণ তাঁহার চোখের সুমুখেই এই হিতকর বিরাট অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হইয়া প্রায় সমাধা হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মেয়েকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ্, নারাণি, চেয়ে দেখ্! তোর দেওরের কাণ্ডটা একবার দেখ্। উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ পুঁতে বলে কি না ছায়া হবে। আবার ওদিকে দেখ হতভাগা ভোলার কাণ্ড। একটা আস্ত বাঁশঝাড় কেটে নিয়ে ঢুক্‌চে—বেড়া দেওয়া হবে!

নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই এক-রাশ বাঁশ ও কঞ্চি টানিয়া ভোলা উঠানে ঢুকিতেছে। ভোলা রামের প্রায় সমবয়সী। নারায়ণী হাসিতে লাগিলেন। ওদিকে মায়ের ক্রুদ্ধ ব্যস্ত ভাব, এদিকে রামের এই পাগলামি, সমস্ত জিনিসটাই তাঁহার কাছে পরম হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া ঠেকিল। হাসিয়া বলিলেন, উঠানের মাঝখানে অশ্বত্থ গাছ কি হবে রে?

রাম আশ্চর্য হইয়া বলিল, কি হবে বৌদি! কেমন চমৎকার ঠাণ্ডা ছায়া হবে বল ত, আর এই যে ছোট ডালটি দেখছ—এটি বড় হ'লে—এই গোবিন্দ, আঙ্গুল দেখাস্‌ নে—বড় হ'লে, গোবিন্দের জন্য একটা দোলা টাঙিয়ে দেব। ভোলা, একটু উঁচু ক'রে বেড়া দিতে হবে, নইলে কালী গলা বাড়িয়ে খেয়ে নেবে, দে, কাটারীখানা আমার হাতে দে, তুই পারবি নে। খট—খট ঠক্ ঠক্ করিয়া বাঁশ কাটা শুরু হইয়া গেল।

নারায়ণী হাসি হাসিতে কক্ষস্থিত পূর্ণ কলস রান্নাঘরে রাখিয়া দিতে চলিয়া গেলেন।

রাগে দিগম্বরীর চোখ জ্বলিতে লাগিল। মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তুই যে কিছু বললি নে? ঐখানে তবে অশ্বত্থ গাছ হোক?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, মা, ব্যস্ত হ'চ্চে কেন, অত বড় গাছ কখন হয়? ওর কি শেকড়-বাকর আছে যে ঘড়া ঘড়া জল ঢাল্‌লেই বাঁচবে? ও ত কালই শুকিয়ে যাবে।

দিগম্বরী কিছুমাত্র শান্ত না হইয়া বলিলেন, শুকুবে না ছাই হবে, ভাল চাস, ত উপড়ে দে গে।

নারায়ণী শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, বাপ রে। তা হ'লে আর কারো রক্ষে থাকবে না।

দিগম্বরী বলিলেন, কেন, বাড়ি কি ওর একলার যে মনে করলেই উঠানের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছ পুঁতে দেবে? তোরা কি কেউ নস,? আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়? মা গো, অশ্বত্থ গাছের উপর এসে রাজ্যের কাক, চিল, শকুনি বাসা করবে, হাড়-গোড় ফেলে নোঙরা করবে—আমি ত নারাণি, তা হ'লে থাক্‌তে পারব না। ওকে তোদের এত ভয় কি জন্যে শুনি? আমার যদি বাড়ি হ'ত নারাণি, তা হ'লে দেখতুম, ও কত বড় বজ্জাত। একদিনে সোজা ক'রে দিতুম।

নারায়ণী মায়ের বুকের ভেতরটা যেন দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমানুষ, ওর এখন কি বুদ্ধি হয়েছে মা! বুদ্ধি থাকলে কি কেউ নিজের বাড়ির উঠোনে অশ্বত্থ গাছ পোঁতে? দুদিন থাক, তার পরে আপনিই ফেলে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, ফেলে দেবে? ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।

নারায়ণী কহিলেন, না মা, ও কাজ করো না, তোমাকে বলচি, ওকে চেন না। আমি ছাড়া ওর ভাইও ছুঁতে সাহস করবে না, মা। আজকের দিনটা যাক্।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তুই কাপড় ছাড়গে যা।

দুপুর বেলা নারায়ণী নিজের ঘরে বসিয়া বালিশের ওড় সেলাই করিতেছিলেন, নেত্য ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, মা সর্বনাশ হ'য়েছে! দিদিমা ছোটবাবুর গাছ ফেলে দিয়েছে! সে ইস্কুল থেকে এসে আর কাউকে বাঁচতে দেবে না! নারায়ণী সেলাই ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, সত্যই গাছ নাই।

বলিলেন, মা, রামের গাছ কি হল?

দিগম্বরী মুখখানা হাঁড়িপানা করিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, ওই!

নারায়ণী কাছে আসিয়া দেখিলেন, সেটি শুধু তুলিয়া ফেলা হয় নাই, মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া রাখা হইয়াছে। তখনই নিঃশব্দে তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া নারায়ণী ঘরে চলিয়া গেলেন।

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাম সর্বাগ্রে তাহার গাছটি দেখিতে গিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বৌদি, আমার গাছ?

নারায়ণী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, বল্‌চি এদিকে আয়।

না, যাব না।

এদিকে আয় না, বল্‌চি।

রাম কাছে আসিতেই তিনি হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া কোলের

উপর বসাইয়া মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, মঙ্গলবারে কি অশ্বত্থ গাছ পুঁততে আছে রে?

রাম শান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কি হয়?

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে বাড়ির বড়বৌ মরে যায় যে!

রাম এক মুহূর্তে ম্লান হইয়া গিয়া বলিল, যাঃ, মিছে কথা!

নারায়ণী হাসিমুখে বলিলেন, না রে মিছে কথা নয়, পাঁজিতে লেখা আছে।

কই পাঁজি, দেখি?

নারায়ণী মনে মনে বিপদগ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুই কি ছেলে রে, মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতে নেই—তুই দেখ্‌বি কি রে? এ কথা ভোলাও জানে? আচ্ছা—ডাক তাকে!

এত বড় অজ্ঞতা পাছে ভোলার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে তৎক্ষণাৎ অপ্রতিভ হইয়া তাহার দুই বাহু দিয়া মাতৃসমা বড়বধুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল, এ আমি জানি; কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?

নারায়ণী তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না, আর দোষ নেই। তাঁহার চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ রে রাম, আমি ম'রে গেলে তুই কি করবি?

রাম সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, যা, বলতে নেই।

নারায়ণী অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো হলুম, মরব না রে! এবারে রাম পরিহাস বুঝিতে পারিয়া মুখ তুলিয়া সহাস্যে বলিল, তুমি বুড়ো বুঝি? একটি দাঁতও পড়েনি, একটি চুলও পাকেনি!

নারায়ণী বলিলেন, চুল না পাকতেই আমি নদীর জলে একদিন ডুবে মর্‌ব। নাইতে যাব আর ফিরে আসব না!

কেন বৌদি?

তোর জ্বালায়! আমার মাকে তুই দেখতে পারিস্‌ নে, দিনরাত ঝগড়া করিস, সেই দিন তোরা টের পাবি, যেদিন আমি আর ফিরব না।

কথাটা রাম বিশ্বাস করিল না বটে, তথাপি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া বলিল, আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না; কিন্তু ও কেন আমাকে অমন করে বলে?

বললেই বা। উনি আমার মা, তোরও গুরুজন। আমাকে যেমন তুই ভালবাসিস্‌, ওঁকেও তেমনি ভালবাস্‌বি।

রাম আবার বৌদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল। এইখানে মুখ রাখিয়া সে এই দীর্ঘ তের বৎসর বাড়িয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া এত বড় মিথ্যা কথা মুখে আনিবে। এ যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য।

নারায়ণী আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, মুখ লুকালে কি হবে বল!

ঠিক এই সময়ে দিগম্বরী দেখা দিলেন। কণ্ঠস্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, কাজকর্ম নেই নারাণি? দেওরকে নিয়ে সোহাগ হ'চ্ছে, নিজের ছেলেটা যে ওদিকে সারা হয়ে গেল।

রাম তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল।

নারায়ণী জোর করিয়া তাহার মুখ বুকের উপর টানিয়া লইয়া মাকে বলিলেন, ছেলেটা সারা হয়ে গেল কিসে?

কিসে? বেশ! বলিয়া দিগম্বরী প্রস্থান করিলেন।

বানাইয়া বলিবার মত একটা মিথ্যা কথাও তিনি খুঁজিয়া

পাইলেন না। রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, ও ডাইনির আমি গলা টিপে দেব।

নারায়ণী তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, চুপ কর্‌ পাজি, মা হয় যে।

দিন চারেক পরে একদিন ভাত খাইতে বসিয়া 'উঃ আঃ' করিয়া বার-দুই জল খাইয়া রাম ভাতের থালাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল—ঐ ডাইনি বুড়ীর রান্না আর আমি খাব না, কখ্‌খন খ্যব না, ঝালে মুখ জ্ব'লে গেল বৌদি—ও বৌদি—

চীৎকার শুনিয়া নারায়ণী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন।

কি হ'ল রে?

রাম রাগে কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কখ্‌খন খাব না, কখ্‌খন খাব না—ওকে দূর ক'রে দাও। বলিতে বলিতে ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিলেন, মা, বার বার বলি, তরকারীতে এত ঝাল দিও না, এত ঝাল খাওয়া এ বাড়ির কারো অভ্যাস নাই।

দিগম্বরী অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, ঝাল আবার কোথায়? দুটি লঙ্কা শুধু গুলে দিয়েচি, এতেই এত কাণ্ড!

নারায়ণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নাই দিলে মা দুটো লঙ্কা! কেউ যখন খায় না তখন—

চুপ কর নারাণী, চুপ কর। রান্না শেখাতে আসিস্‌, নে আমাকে, চুল পাকালুম এই করে, এখন পেটের মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হবে। ধিক আমাকে!

নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া রান্নাঘড়ে গিয়া নূতন করিয়া রাঁধিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন।

দিগম্বরী দুয়ারে পা ছড়াইয়া বসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাই রে। কোথায় আছিস্, একবার ডেকে নে! আর সহ্য হয় না! যা মুখে আসে, আমাকে তাই ব'লে গাল দেয় রে! আমি বুড়ি! আমি ডাইনি! আমাকে দূর ক'রে দিতে বলে। আমি এমন মেয়ে-জামায়ের ভাত খেতে এসেচি—আমার গলায় দড়ি জোটে না। এর চেয়ে পথে ভিক্ষে করা শতগুণে ভাল। সুরো, আয় মা, আমরা যাই, এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করব না।

সুরধনী কাঁদ কাঁদ হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দিগম্বরী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

নারায়ণী বঁটি কাত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগম্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, না, তা, আটকাস্ নে আমাদের, নারাণি, যেতে দে। আমরা অনাহারে গাছতলায় মরব সেও ভাল, কিন্তু তোদের ভাত খাব না, তোদের ঘরে শোব না।

নারায়ণী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, কার ওপর রাগ করে যাচ্ছ মা? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকি সুরে কহিলেন, আমি কচি খুকি নই, নারাণি, সব বুঝি। তোর ইশারা না থাকলে কি ওর কখন অত সাহস হয়? আমি ডাইনি? অ্যাঁ আমাকে দূর করে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি! আমরা তোদের আপদ বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড় বলচি।

নারায়ণী মায়ের দুই পায়ে হাত দিয়া বলিলেন, মা, আজকের মত মাপ কর! আচ্ছা, উনি আসুন, তার পর যা ইচ্ছে হয় ক'রো। তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া দুই পায়ে জল ঢালিয়া আঁচল দিয়া মুছাইয়া একটা পিঁড়ির উপর বসাইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোধটা তাঁহার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু দুপুর বেলা শ্যামলাল আহারে বসিতেই, তিনি কপাটের অন্তরালে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রথমটা শ্যামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে একটু একটু করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া অর্ধভুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া গেলেন।

নারায়ণী বুঝিল এ রাগ কাহার উপরে। নৃত্যকালী সহ্য করিতে পারিল না। বাড়ির মধ্যে সে ছিল স্পষ্টবাদিনী। চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, দিদিমা জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে বাবুকে খেতে দিলে না। চোখের জল ত তোমার শুকিয়ে যাচ্ছিল না দিদিমা, না হয় দু'মিনিট পরেই বার করতে!

দিগম্বরী মুখ কালি করিয়া নিরুত্তরে রহিলেন।

দুপুর-বেলা রাম কোথা হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিয়া তাহার বৌদির ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি গোবিন্দকে লইয়া শুইয়া আছেন। ব্যাপারটা তাহার বড় ভাল বোধ হইল না। তথাপি আস্তে আস্তে বলিল, ক্ষিদে পায় যে!

বৌদিদি কথা কহিলেন না।

সে আর একটু জোর দিয়া বলিল, কি খাব?

নারায়ণী শুইয়া থাকিয়াই বলিলেন, আমি জানি নে যা এখান থেকে।

না যাব না—আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে জ্বালাতন করিস্ নে রাম! নেত্য আছে, তাকে বল্‌গে।

রাম আর কিছু না বলিয়া বাহিরে আসিয়া নেত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল, খেতে দে নেত্য।

নেত্য বোধ করি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, এক বাটি দুধ, কিছু মুড়ি ও চার-পাঁচটা নারিকেল নাড়ু আনিয়া দিল।

রাম রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এই বুঝি?

নেত্য বলিল, ছোটবাবু, ভাল চাও ত আজ আর হাঙ্গামা ক'রো না। বাবু না খেয়ে কাছারি চলে গেছে, মা উপোস ক'রে গোবিন্দকে নিয়ে শুয়ে আছে। গোলমাল শুনে যদি উঠে আসে—তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে তা ব'লে দিচ্ছি।

রাম তাহা দেখিয়াই আসিয়াছিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খানিকটা দুধ খাইয়া মুড়ি ও নাড়ু কোঁচড়ে ঢালিয়া পুকুরধারে গাছতলায় গিয়া বসিল। তাহার আহারের প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছিল। বৌদি উপোস করিয়া আছে! সে অন্যমনস্ক হইয়া মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে ভাবিতে লাগিল, তাহার মুনি ঋষিদের মত কোন একটা মন্ত্র জানা থাকিলে এইখানে বসিয়াই সে বৌদির পেট ভরাইয়া দিত; কিন্তু মন্ত্র না জানিয়া কি উপায়ে যে কি করা যায়, ইহা কোনমতে স্থির করিতে পারিল না। ফিরিয়া গিয়া তাহাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাছাড়া দাদা খায় নাই। অনুরোধ করিলেই বা কি হইবে! সে কোঁচর হইতে মুড়ি প্রভৃতি জলের উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেবলই মনে মনে যত রকম করিয়াই আবৃত্তি করিল, ততবারই তাহার মনের মধ্যে ছুঁচ ফুটিল।

রাত্রে শ্যামলাল ভার্যাকে বলিলেন, আমার আর সহ্য হয় না।

ওকে নিয়ে আর বাস করা চলে না।

নারায়ণী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কথা বল্‌চ ?

রামের কথা। তোমার মা আমাকে চার-পাঁচদিন ধরে ক্রমাগত বলচেন,, রাম ওঁকে না-হক অপমান করচে। আমি পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-আশয় সমস্ত ভাগ ক'রে ওকে আলাদা ক'রে দেব। আমি আর পারি নে।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, রামকে আলাদা ক'রে দেবে? ও কথা মুখেও এনো না। ও দুধের ছেলে, বিষয়-আশয় নিয়ে কি করবে শুনি ?

শ্যামলাল বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, দুধের ছেলেই বটে! আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কি করবে সে ওই জানে।

নারায়ণী বলিলেন, ও জানে না, আমি জানি; কিন্তু মা বুঝি তোমাকে চার-পাঁচদিন ধ'রে ক্রমাগত ঐ কথা বলে বেড়াচ্ছেন ?

শ্যামলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না, উনি কিছুই বলেননি, লোকেরও ত চোখ আছে গো! আমি নিজে কি কিছুই দেখতে পাইনে, তাই তুমি মনে কর ?

নারায়ণী বলিলেন, না, আমি তা মনে করি নে; কিন্তু ওর কে আছে? কাকে নিয়ে ও পৃথক হবে? মা আছে, না বোন আছে, না একটা মাসি-পিসি আছে? ওকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

শ্যামলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি ও সব জানি নে। মুখে বলিলেন, বটে, জানি না, অন্তরে জানিতেছিলেন। এতবড় সত্যটা না জানিয়া পথ কোথায় ?

নারায়ণী কি কথা বলিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ভারী গলায় বলিলেন, দেখ, তের বছর বয়সে মেয়েরা যখন

পুতুল খেলে বেড়ায় তখন মা আমার মাথায় এই মস্ত সংসারঠা ফেলে রেখে স্বানন্দে স্বর্গে চলে গেলেন। তিনি দেখচেন, এ ভার বইতে পেরেছি কি না। রেঁধেচি বেড়েচি, ছেলে মানুষ করেচি, লোক-লৌকিকতা, কুটুম্ব, সংসার—সমস্ত এই একটা মাথায় ব'য়ে ব'য়ে আজ ছাব্বিশ বছরের হয়েচি। এখন আমার ঘর-কন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এস, সত্যি বলচি তোমাকে, আনি নদীতে ডুব দিয়ে মরব! তখন আর একটা বিয়ে ক'রে রামকে আলাদা করে দিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন ক'রে সংসার করো, আমি দেখতেও যাব না, বলতেও যাব না; কিন্তু এখন নয়।

শ্যামলাল মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করিতেন, আর কথা কহিলেন না। কথাটা এখানেই সেই রাত্রে বন্ধ হইয়া রহিল। পরদিন নারায়ণী রামকে কাছে বসাইয়া গভীর স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, রাম, তোর এখানে আর থেকে কাজ নেই ভাই। তুই আলাদা কোথাও থাক্ গে যা—পারবি নে থাক্‌তে?

রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, পারব বৌদি। তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা, কবে যাওয়া হবে বৌদি?

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। ইহার পরে আর কি বলিবেন তিনি। কিন্তু রাম কথাটা থামিতে দিল না। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিল, কবে যাব বৌদি?

তিনি সে কথার উত্তরে তাহার মুখটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোর বৌদিকে ছেড়ে একলা থাক্‌তে পারবি নে?

রাম মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আর বৌদি যদি ম'রে যায়?

যাঃ—

যা নয়! এখন বৌদির কথা শুনিস্ নে—তখন দেখ্‌তে পাবি!

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখন তোমার কথা শুনি নে?

নারায়ণী বলিলেন, কখন শুনিস্, তাই বল্। কতদিন ব'লেছি, আমার মাকে তুই অপমান করিস্ নে, তবু তাঁকে অপমান করতে ছাড়বি নে। কালও করেছিস্। এইবার আমি যেখানে দুচোখ যায় চলে যাব!

আমিও সঙ্গে যাব।

তুই কি টের পাবি কখন্ যাব! আমি লুকিয়ে চলে যাব।

আর গোবিন্দ?

সে তোর কাছে থাক্‌বে, তুই মানুষ করবি।

না, আমি পারব না বৌদি।

নারায়ণী হাসিয়া বলিলেন, তোকে পারতেই হবে।

তখন রাম সমস্ত কথাটা অবিশ্বাস করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, সব মিছে কথা। কোথাও যাবে না।

মিছে নয়—সত্যি! দেখিস্, আমি চলে যাব।

রাম অনুতপ্ত হইয়া বলিল, আর যদি তোমার সব কথা শুনি, তা হ'লে?

নারায়ণী হাসীমুখে বলিলেন, তা হ'লে যাব না। তোকেও আর গোবিন্দকে মানুষ করতে হবে না।

রাম খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা, আজ থেকে তুমি দেখো।

॥ ৩ ॥

আট দিন বেশ নিরুপদ্রবে কাটিল। দিগম্বরী যে কটাক্ষ করিতেন না তাহা নহে, কিন্তু রাম রাগ করিত না। বৌদিদির সেদিনকার কথা ঠিক বিশ্বাস না করিলেও তাহার ভয় হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ভগবান বিরূপ, আবার দুর্ঘটনা ঘটিল। আজ দিগম্বরী তাঁহার পিতৃদেরের উদ্দেশে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের সংকল্প করিয়াছিলেন। পিতার ত্রতাত্মা এতদিন ছেলের বাড়িতে চুপ করিয়াছিল, এখন নাত জামাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল; অবশ্য স্বপ্নে—তবু তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত!

সকাল-বেলা রাম আঁক কষিতেছিল; ভোলা আসিয়া চুপি চুপি খবর দিয়া গেল, দা'ঠাকুর, ভগা বাগ্দী তোমার কেত্তিক-গনেশকে চাপবার জন্যে জাল এনেছে. দেখবে এস।

একটু বুঝাইয়া বলি। বহুদিনের পুরাতন গোটা-দুই খুব বড় গোছের রুইমাছ ঘাটের কাছে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইত। মানুষজনকে সে দুটো আদৌ ভয় করিত না। রাম বলিত, এরা তার পোষা মাছ এবং নাম দিয়াছিল কার্তিক, গণেশ। এ পাড়ায় এমন কেহ ছিল না, যে ব্যক্তি কার্তিক গনেশের অসাধারণ রূপ-গুণের বিবরণ রামের কাছে শোনে নাই, এবং তাহার অনুরোধে একবার দেখিতে আসে নাই। কি যে তাহাদের বিশেষত্ব, তাহা কেবল সে-ই জানিত এবং কে কার্তিক, কে গণেশ, শুধু সে-ই চিনিত। ভোলাও সব সময় ঠাহর করিতে পারিত না বলিয়া রামের কাছে কানমলা খাইত।

নারায়ণী হাসিয়া বলিতেন, রামের কার্তিক গণেশ কাজে লাগবে আমার শ্রাদ্ধের সময়।

ভোলার খবরটা রামকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না। সে শ্লেটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল. একবার চেপে মজা দেখুক না—জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে যাবে।

ভোলা কহিল, না দা’ঠাকুর, আমাদের জাল নয়! ভগা জেলেদের মোটা জাল চেয়ে এনেছে—সে ছিঁড়বে না!

রাম শ্লেট রাখিয়া বলিল, চল ত দেখি!

পুকুর ধারে আসিয়া দেখিল, তাহার কার্তিক গণেশের বিরুদ্ধে সত্যই ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভগা ঘাটের কাছে জলে কতকগুলো মুড়ি ভাসাইয়া দিয়া জাল উদ্যত করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাম আসিয়া তাহাকে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিল, হতভাগা-মুড়ি দিয়ে আমার মাছ ডাকচ!

ভগা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বড়বাবু হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। অন্য মাছ আর পাওয়া গেল না দা’ঠাকুর।

রাম তাহার হাত হইতে জাল ছিনাইয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া বলিল, যা, দূর হ!

ভগা জাল তুলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাম ফিরিয়া আসিয়া পুনর্বার শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিল। সে কাহারও উপর রাগ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দিগম্বরী আজ সকাল সকাল আহ্নিক সারিয়া লইতেছিলেন। নেত্য আসিয়া খবর দিল, মাছ পাওয়া গেল না দিদিমা। ছোটবাবু ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধরে হাঁকিয়ে দিয়েছেন। এই মাছ দুইটার উপর দিগম্বরীর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বড় রুইমাছের মুড়ার সম্বন্ধে বিধবার মনের ভাব অনুমান করিতে নাই। সুতরাং লোভ তাঁহার নিজের জন্য নয় বটে. কিন্তু নিজের কোন একটা কাজে, স্বহস্তে

রাঁধিয়া সদ্‌ব্রাহ্মণের পাতে দিয়া পুণ্য খ্যাতি অর্জন করিবার বাসনা, অনেক দিন হইতে তিনি মনে পোষণ করিতেছিলেন। কাল জামাইয়ের মত লইয়া, অর্থাৎ কার্তিক গণেশ সম্বন্ধে আভাস মাত্র না দিয়া জেলেদের মোটা জাল চাহিয়া আনাইয়া প্রজা ভগা বাগ্দীকে চার আনা বক্‌শিস কবুল করিয়া, সমস্ত আয়োজন একরূপ সম্পূর্ণ করিয়াই রাখিয়াছিলেন। আজ সকালেও সে দুইটা প্রাণীকে ঘাটের কাছে ঘুরিতে দেখিয়া আসিয়া নিশ্চিত হৃষ্ট-চিত্তে জপে বসিয়াছেন। এমন সময় এই দুঃসংবাদটা তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য করিয়া তুলিল। তাঁহার দাঁত কিড়মিড় করা অভ্যাস ছিল। তিনি অকস্মাৎ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া, গলার মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওরে কি শত্তুর আমার! কবে ছোঁড়া ম'রবে রে, আমার হাড়ে বাতাশ লাগবে। বাসিমুখে এখনো জল দিইনি ঠাকুর। যদি সত্যের হও, যেন তে-রাত্তির না পোহায়।

কাছে বসিয়া নারায়ণী তরকারি কুটিতেছিলেন। বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, 'মা'। শুনিয়াছি সন্তানের মুখে মাতৃ সম্বোধনের তুলনা নাই। নারায়ণীর মুখে মাতৃ-সম্বোধনের আজ বোধ করি তুলনা ছিল না। ঐ এক অক্ষরের ডাকে দিগম্বরীর বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল; কিন্তু নারায়ণীও আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহারও দুই গণ্ড বাহিয়া টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; ক্ষণেক পরে চোখ মুছিয়া যেখানে রাম পড়া তৈরী করিতেছিল সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তুই ভগা বাগ্দীকে মেরে-ধ'রে হাঁকিয়ে দিয়েছিস্?

রাম চমকাইয়া শ্লেট হইতে মুখ তুলিয়া এক মুহূর্তে তাহার

মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, এবং জবাব দিবার লেশমাত্র চেষ্টা না করিয়া ওদিকের দরজা দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

নারায়ণী ভিতরের কথা জানিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া ভগা বাগ্দীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাছ ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

হুকুম পাইয়া ভগা জাল লইয়া গেল এবং অবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রুই ঘাড়ে করিয়া আনিয়া ধড়াস্ করিয়া উঠানের মাঝখানে ফেলিয়া দিল।

নারায়ণী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মাছ দেখিয়া এখন শিহরিয়া উঠিলেন। শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, ওরে, একে ঘাটে ধরিস্ নি ত? এ রামের কাত্তিক গনেশ নয় ত?

ভগা এত শীঘ্র এত বড় মাহ আনিতে পারিয়া বাহাদুরী করিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, মা-ঠাকরুন এ ঘেটো রুই—বড় জবর রুই!

দিগম্বরিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল, ও মা-ঠাক্রুণ এনারেই ধ'ত্তে ব'লে দেছ্ল।

নারায়ণী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নৃত্যকালী যদিও রামের উপর খুব সদয় নহে, তবুও মাছ দেখিয়া সে রাগিয়া উঠিল। দিগম্বরীকে বলিল, আচ্ছা দিদিমা, পাড়ায় লোকে জানে ছোটবাবুর কাত্তির গণেশের কথা। তুমি কি ব'লে এ মাছ ধ'রতে ব'লে দিলে? দু তিনটে পুকুরে কি আর মাছ ছিল না? দশটা লোকে খাবে, তা একটা আধমণি মাছই বা কি হবে? লুকিয়ে ফেল একে, কোথায় গেছে তিনি, এসে পড়্বে।

দিগম্বরী মুখ ভারী করিয়া বলিলেন, জানি না বাপু অত শত। একটা মাছ ধ'রেচে ত সাত গুষ্ঠী মিলে, করে্চে কি দেখনা? একে লুকিয়ে ফেল্‌বি, বামুন খাবে না?

নৃত্য বলিল, তোমার বামুন খাবে দুটো আড়াইটার সময়, ঢের সময় আছে! ছোটবাবু আগে ইস্কুলে যাক্, না হ'লে আজ আর কেউ বাঁচ্‌বে না। ও মা! ভোলা দাড়িয়েছিল সে গেল কোথায়? সে বুঝি তবে খবর দিতে ছুটেছে! যা হয় কর মা আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

ভগা চার আনা পয়সার লোভে জাল চাহিয়া আনিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া নগদ আদায়ের আশা ছাড়িয়া জাল লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রয়োজন হইলে, কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর ধারের পেয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পেয়ারা চিবাইতেছিল। ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখ্‌বে এস দা'ঠাকুর, ভগা তোমার কেত্তিককে মেরেচে।

রাম চিবনো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ—

সত্যি দ'াঠাকুর! মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েছে, এখনো উঠনে প'ড়ে আছে, দেখ্‌বে চল।

রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে? বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে ছুড়িতে লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দাম সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।

তাহাকে খাওয়াইবার জন্য রাত্রে নারায়ণী টানাটানি করিতে

লাগিলেন, রাম তাঁহার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, এবং সমস্ত দিন উপবাসের পর গোটা পাঁচ ছয় ভাত মুখে দিয়া উঠিয়া গেল।

দিগম্বরী আড়ালে দাঁড়াইয়া জামাইকে বলিলেন, তুমি একবার বল, না হলে নারায়ণী খাবে না, সে সারাদিন উপোস ক'রে আছে।

শ্যামলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, উপোস কেন?

দিগম্বরী কান্নার ভাবে কণ্ঠস্বর করুণ কবিয়া বলিলেন, আমার একশ বার ঘাট হয়েছে বাবা। কিন্তু কেমন করে জান্‌ব বল, পুকুর থেকে বামুন-ভোজনের জন্যে একটা মাছ ধরালে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়।

শ্যামলাল বুঝিতে না পারিয়া ডাকিলেন, নেত্য, কি হ'য়েছে রে?

নেত্য আড়াল হইতে বলিল, সেটা ছোটবাবুর গণেশ।

শ্যামলাল চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, রামের কার্তিক গণেশের একটা নাকি!

নেত্য বলিল, হাঁ।

আর বলতে হইল না। তিনি আগাগোড়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন, মা খায়নি বুঝি?

নেত্য বলিল, না।

শ্যামলাল বলিলেন, তবে আর খেতে ব'লে কি হবে? সে খায়নি, ও খাবে কি!

দিগম্বরী বলিতে লাগিলেন, এমন কাণ্ড হবে জান্‌লে বামুন খাওয়াবার কথাও তুলতুম না বাবা! ও নিজে কেনই বা হুকুম দিয়ে মাছ ধরালে, কেনই বা এমন কর্‌চে, তা সে ও-ই জানে। আমি ত চুপ ক'রেই ছিলাম। তবু সব দোষ যেন আমারই। আমাদের না হয় আর কোথাও পাঠিয়ে দাও বাবা, এখানে এক দণ্ডও থাকতে

আর ভরসা হয় না।

একটুখানি চুপ করিয়া রীতিমত কান্নার সুরে পুনরায় শুরু করিলেন, কপাল আমার এমনি করে যদি না-ই পড়্‌বে, অমন ভাই বা মর্‌বে কেন, আমাকেই বা লাথি-ঝাটা খেয়ে এখানে থাকতে হবে কেন ? বাবা, আমরা নিতান্ত নিরুপায়, তাই হাত জোড় ক'রে বলচি, একটা উপায় তোমাকে ক'রে দিতে হবেই।

শ্যামলাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু হা না, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

নারায়ণী আড়ালে দাঁড়াইয়া নিজের মায়ের এই নির্লজ্জ ঠকামোয়, লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া রামের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়া ডাকিলেন, লক্ষ্মী, মাণিক আমার! দোরটা একবার খুলে দে।

রাম জাগিয়া ছিল, কিন্তু সাড়া দিল না।

নারায়ণী আবার ডাকিলেন, ওঠ্‌,—দোর খোল্‌।

এবার চেঁচাইয়া বলিল, না খুলব না, তুমি যাও। তোমরা সবাই আমার শত্তুর।

আচ্ছা ভাই, তুই দোর খোল।

না, না, না, আমি খুলব না। সত্যই সে রাত্রে কপাট খুলিল না। শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিলেন। নারায়ণী ঘরে আসিতে বলিলেন, হয় একটা উপায় কর, না হয় যেখানে ইচ্ছে আমি চ'লে যাব। এত হাঙ্গামা আমার বরাদাস্ত হয় না!

নারায়ণী নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দুই তিন দিন কাটিয়া গেলেও যখন রামের রাগ পড়িতে চাহিল না, তখন নারায়নী ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আজ সন্ধ্যা হয়, তবুও সে ইস্কুল হইতে

ফিরিল না দেখিয়া নারায়ণী উৎকণ্ঠিত ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় দিগম্বরী নদী হইতে গা ধুইয়া, সংসারের সংবাদ লইয়া, রামের অমঙ্গল কামনা করিয়া, বড় মেয়ের সৃষ্টিছাড়া মতি বুদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলাফল প্রতিবাসিনীদের কাছে ঘোষণা করিয়া, শোকে তাপে অসময় অল্প বয়সে নিজের মাথার চুল পাকাইবার কারণ দর্শাইয়া নিজেকে বড় মেয়ে নারায়নীর প্রায় সমবয়সী বলিয়া প্রচার করিয়া ভাইয়ের সংসারে কিরূপ সর্বময়ী ছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস বলিয়া, ধীরে সুস্থে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কাণ্ড শুনিয়া তিনি যেন বাতাসে উড়িতে উড়িতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। উঠানে পা দিয়াই উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তোর গুণধর দেওরের কাণ্ড শুনেছিস নারাণি?

নারায়ণী ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিলেন, কি কাণ্ড?

দিগম্বরী বলিলেন, থানায় গেছে। যাবেই ত। যে বজ্জাত ছেলে বাবা, এমনটি সাত জন্মে দেখিনি।

তাঁহার মুখে চোখে আহ্লাদ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। নারায়ণী সে কথার জবাব না দিয়া ডাকিল, নেত্য, রাম এখনো এল না কেন, একবার ভোলাকে পাঠিয়ে দে—খুঁজে আনুক।

দিগম্বরী বলিলেন, আমি যে শুনে এলুম।

নেত্য শুনিবার আগ্রহে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল, নারায়নী তাড়া দিয়া উঠিলেন, দাঁড়িয়ে থাকলি যে? কথা কানে গেল না বুঝি?

নেত্য ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল, দিগম্বরী কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি হয়েচে জানিস, নারাণি?

তুমি ভিজে কাপড় ছাড়ো গে মা, তার পরেই না হয় বলো, বলিয়া তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন। দিগম্বরী অবাক হইয়া মনে মনে বলিলেন, বাস্ রে! মেয়ের রাগ দেখ! এমন একটা কাণ্ড

আনুপূর্বিক বলিতে না পাইয়া তাঁহার পেট ফুলিতে লাগিল।

সে কাণ্ডটা সংক্ষেপে এই—গ্রামের স্কুলে জমিদারের এক ছেলে পড়িত। আজ টিফিনের সময় তাহার সহিত রামের তর্ক বাধিল। বিষয়টা জটিল, তাই মীমাংসা না হইয়া মারামারি হইয়া গেল। জমিদারের ছেলে বলিয়াছিল, শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্মশানকালী রক্ষাকালীর চেয়ে অধিক জাগ্রত। কেন না, শ্মশানকালীর জিভ বড়।

রাম প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, শ্মশানকালীর জিভ একটু চওড়া বটে কিন্তু অত বড়ও নয়, অমন রাঙাও নয়। কিছুদিন পূর্বে পাড়ায় চাঁদা করিয়া রক্ষাকালীর পূজা হইয়া গিয়াছিল, সে স্মৃতি রামের মনে উজ্জ্বল ছিল। জমিদারের ছেলে রামের কথা অস্বীকার করিয়া নিজের করতল তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রক্ষাকালীর জিভ ত এতটুকু?

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কিএতটুকু? কখ্‌খন না। এই এত বড়! এতটুকু জিভ হ'লে কি কখনও পৃথিবী রক্ষা করতে পারে? পৃথিবী রক্ষা করে বলেই ত রক্ষাকালী নাম।

তারপর আর দুই একটা কথা, এবং তারপরই ঘুষাঘুষি। জমিদারের ছেলের পায়ে জোর ছিল কম, সুতরাং মার সেই-ই বেশী খাইল। নাক দিয়া ফোঁটা দুই রক্ত বাহির হইল। এই ক্ষুদ্র স্কুলের জীবনে এত বড় কাণ্ড ইতিপূর্বে ঘটে নাই। যে জমিদারের স্কুল, তাহারই পুত্রের নাকে রক্ত! অতএব হেড্‌ মাস্টার নিজে স্কুল বন্ধ করিয়া ছেলেটিকে লইয়া দরবার করিতে ছুটিলেন। বলা বাহুল্য, রামলাল বহু পূর্বেই অন্তর্ধান হইয়াছিল।

ভোলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দা'ঠাকুরকে পাওয়া গেল না।

অনতিকাল পরে শ্যামলাল মুখ কালি করিয়া বাড়ি আসিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওগো শুনচ? এ গ্রামে থেকে বাস উঠাতে হল

দেখ্‌চি। চাকরি করে দু'পয়সা ঘরে অন্‌ছিলুম, তাও বোধ করি এবার ঘুচ্‌ল। নারায়ণী ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া একটা চৌকাটে ভর দিয়া শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁরা থানায় গেছেন না?

শ্যামলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, বাবু শিবতুল্য লোক তাই মাপ করেচেন, কিন্তু আরও পাঁচজন আছে ত? দিন দিন এক একটা নূতন ফ্যাসাদ তৈরী হলে কি করে গ্রামে বাস করি, বল! রাম কই?

নারায়ণী বলিলেন, সে এখনো আসেনি। বোধ করি, ভয়ে পালিয়েছে। শ্যামলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালালেও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, না পালালেও নেই। সে সৎমার ছেলে, লোকে নিন্দা কর্‌বে, তাই ত এতদিন কোন মতে সহ্য করেছিলুম; কিন্তু আর নয়। এখন নিজের প্রাণ বাঁচাতে হবে।

দিগম্বরী রান্নাঘরের বারান্দা হইতে বলিলেন, নিজের ছেলেটার পানেও তা চাইতে হবে।

শ্যামলাল উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, হবে না, মা, নিশ্চয় হবে। তবে কাল পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে বিষয়-সম্পত্তি আলাদা করে ফেল্‌ব। আর তোমাকেও বলে রাখ্‌লুম, এ নিয়ে ওকে বকা-ঝকা করবার দরকার নেই। ও যা ভাল বোঝে, তাই করে। ভাল বুঝেচে, মনিবের ছেলের গায়ে হাত তুলেচে।

দিগম্‌বরী মনে মনে পরামানন্দিত হইয়া বলিলেন, নারাণি কেন যে ওকে শাসন করতে যায়—আমার ত দেখে ভয়ে বুক কাঁপে! যে গোঁয়ার ছেলে, ও আমাকে যখন অপমান করে তখন ওকে অপমান করে ফেলবে, এ কি বেশী কথা! আমি বলি, শোন! নিজের মান নিজের ঠাঁই—রামের কথায় থেকো না।

শ্যামলাল শ্বশ্রূর এ কথাটায় আর সায় দিতে পারিলেন, না, বোধ করি, চক্ষুলজ্জা হইল। বলিলেন যাই হোক. ওকে শাসন

করবার দরকার নেই।

নারায়ণী পাথরের মূর্তির মত নির্বাক নিশ্চল হইয়া সমস্ত শুনিলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। তারপরে ধীরে ধীরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবু ঘরে এসেছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া, রামের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। রাম খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল, দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, বৌদিদি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ঘরের কোণে তাহারই একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল তাহাই তুলিয়া লইতেছেন। সে তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া খাটের ওধারে গিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী ডাকিলেন, এদিকে আয়।

রাম হাতজোর করিয়া বলিল, আর করব না বৌদি! এইবারটি ছেড়ে দাও।

নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, এলে কম মার্‌ব, কিন্তু না এলে এই বেত তোমার পিঠে ভাঙ্গব।

রাম তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া নিমতি করিতে লাগিল, তিন সত্যি করছি বৌদি, তার কোন দিন কর্‌ব না, কান মল্‌ছি বৌদি—

নারায়ণী খাটের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া সপাৎ করিরা এক ঘা বেত তাহার ঘাড়ের উপর বসাইয়া দিলেন; তাহার পর বেতের উপর বেত পড়িতে লাগিল। প্রথমটা সে ওদিকের দোর খুলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, তারপর ধরমর ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল, শেযে পায়ের তলায় পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল নেত্য পেছনে আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিল, কাঁদিয়া বলিল, মা,

ছেড়ে দাও মা, আমি ঘাট মানছি—

দিগম্বরী খিচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই সব কাজে কথা কইতে আসিস্ কেন বল্ ত?

শ্যামলাল ঘরের ভিতর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, কি হচ্ছে ও—সারারাত ঠেঙাবে না কি?

নারায়ণী বেত ফেলিয়া বলিলেন, মনে থাকে যেন।

॥ ৪ ॥

রাম ভাত খাইতে বসিয়াছিল। দিগম্বরী আড়ালে বসিয়া সুর তুলিয়া বলিলেন, অত বড় ছেলেকে অমন করে মারা কেন? ওর বড় ভাই কোন দিন গায়ে হাত তোলে না।

নেত্য কাজ করিতে করিতে বলিল, তুমি কম নও, দিদিমা তুমিই ত ও-সব কথা মাকে এসে লাগাও।

সে রাত্রে অত মার তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই; রাম শুনিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, ডাইনী বুড়ী আমাদের সব খেতে এসেছে।

দিগম্বরী চেঁচাইয়া উঠিলেন, নারাণি শুনে যা তোর দেওরের কথা।

নারাণী স্নান করিতে যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে বলিলেন, পারিনে আর কথা শুনতে, সত্যি বলচি নেত্য মরণ হলে আমার হাড় জুড়োয়—আর সহ্য হচ্ছে না। ওরে ও বাঁদর, এখনো তোর পিঠের দাগ মিলায়নি, এর মধ্যেই সব ভুলে গেলি?

রাম জবাব দিল না, ভাত খাইতে লাগিল। নারায়ণী আর কোন কথা না বলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। উঠানের

উপরেই একটা পেয়ারা গাছ ছিল, ভাত খাইয়া রাম তাহার উপর উঠিল এবং নির্বিচারে কাঁচা-পাকা পেয়ারা চর্বণ করিতে লাগিল। কোনটার কতকটা খাইল, কোনটার একটু কামড়াইয়া ফেলিয়া দিল। নিতান্ত কাঁচাগুলো নিরর্থক ছিড়িয়া এদিকে ওদিক ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। দেখিয়া দিগম্বরীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। নারায়ণী বাড়ীতে নাই, তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, তোমার জন্য ত বাছা, পাকা পেয়ারা দাঁতে কাটবার যো নেই, কাঁচাগুলো নষ্ট করে কি হচ্ছে

রাম কোন দিনই তাঁহার কথা সহিতে পারিত না। বিশেষ একমাত্র নেত্যর কাছে মার খাইবার কারণ জানিতে পারিয়া রাগে ফুলিতেছিল, গাছের উপর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, বেশ করছি—বুড়ী!

এই বিশেষণটা দিগম্বরী সবচেয়ে অপছন্দ করিতেন, মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, বুড়ী! বেশ কচ্চ! আচ্ছা, আসুক সে!—যেমন কুকুর, তেমন মুগুর হওয়া চাই ত! কি বেহায়া ছেলে বাবা! মার খেয়ে খেয়ে পিঠের চামড়া উঠে গেল, তবু লজ্জা হল না!

রাম উপর হইতে বলিল; ডাইনী বুড়ী!

ডাইনী বুড়ী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! পাজি হতভাগা —নাব বলচি!

রাম বলিল, নাব্‌ব কেন? তোমার বাবার গাছ?

দিগম্‌বরী ক্ষেপিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, অ্যাঁ—বাপ তুললি? শুনলি নেত্য, শুন্‌লি?

ঠিক এই সময় নারায়ণী ঘাট হইতে আসিয়া পড়িলেন। গাছের উপর দৃষ্টি পড়িতেই বলিলেন, ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলেন? গাছে চড়েছিস্ যে!

রাম ভাবিয়া রাখিয়াছিল, গাছের উপর হইতে দূরে বৌদিকে

আসিতে দেখিয়াই সে নামিয়া পালাইবে; কিন্তু ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকায় পথের দিকে নজর করে নাই। বৌদিদি একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সে সভয়ে বলিল, পেয়ারা খাচ্ছি।

তা ত খাচ্চিস্—স্কুলে গেলিনে?

আমার পেট কাম্‌ড়াচ্চে যে!

নারায়ণী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তাই ভাত খেয়ে উঠে কাঁচা পেয়ারা চিবোচ্চ?

দিগম্‌বরী মেয়ের গলা শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, হতস্থাড়া ছোঁড়া আমার বাপ্ তোলে! বলে, নাবব কেন—তোর বাপের গাছ?

নারায়ণী চোখ তুলিয়া বলিলেন, বলেছিস্?

রাম চোখ-মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, না বৌদি, বলিনি।

দিগম্‌বতী চেঁচাইয়া উঠিলেন, বলিস্‌নি হতভাগা? নেত্য সাক্ষী আছে। তারপর মুখ বিকৃত করিয়া সানুনাসিক স্বর করিয়া বলিতে লাগিলেন, সে দিন যখন বেতের উপর বেত পড়েছিল, তখন—আঁর কঁরব না বৌঁদি—পাঁয়ে পঁড়ি বৌঁদি—মরে গেঁলুম বৌঁদি,—চেপে ধরলে চিঁ চিঁ কর, আর ছেড়ে দিলে লাফ মার, বদ্‌মাইশ!

রাম আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহার হাতে একটা বড় কাঁচা পেয়ারা ছিল—ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিয়া দিল। সেটা দিগম্‌বরীকে স্পর্শ করিল না, নারায়ণীর ডান ভ্রূর উপরে গিয়া সজোরে আঘাত করিল। এক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখিয়া তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। দিগম্‌বরী ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, নেত্য কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, রাম গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারিল।

দুপুর বেলা শ্যামলাল স্নানাহার করিতে আসিয়া দেখিলেন বিষম কাণ্ড! নারায়ণী নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন,

তাঁহার ডান চোখ ফুলিয়া ঢাকিয়া গিয়াছে। তাহার উপর ভিজা ন্যাকড়ার পটি বাঁধিয়া নেত্য পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। দিগম্বরী আজ আর আড়ালে গেলেন না, সামনেই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, রাম মেরে ফেলেচে নারায়ণীকে!

শ্যামলাল চমকাইয়া উঠিলেন। কাছে আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, কঠিনভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, আজ তোমাকে আমি দিব্যি দিচ্ছি, যদি ওকে খেতে দাও, যদি কোন দিন কথা কও, যদি কোন কথায় থাক, সেই দিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও।

নারায়ণী শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, চুপ কর, চুপ কর—ও কথা মুখে এনো না।

শ্যামলাল বলিলেন, আমার এত বড় দিব্যি যদি না মান, সেই দিনে যেন তোমাকে আমার মরা মুখ দেখতে হয়। বলিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে নিজেই চলিয়া গেলেন।

সমস্ত দিন নদীর ধারে ধারে বেড়াইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া, অসম্ভবকল্পনা করিয়া রাম সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিল। দেখিল, উঠানের মাঝামাঝি ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া বাড়িটাকে দুই ভাগ করা হইয়াছে। নাড়া দিয়া দেখিল, বেশ শক্ত, ভাঙা যায় না। রান্নাঘরে আলো জ্বলিতেছিল, চুপি-চুপি মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেখানেও ওই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘরে কেহ নাই, শুধু একরাশ পিতল-কাঁসার বাসন মেঝের উপর পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা যে কি, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, সকালবেলার কাণ্ডটার সহিত কেমন করিয়া যেন যোগ রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া তাহার বুক শুকাইয়া উঠিল। তখন ফিরিয়া গিয়া সে চুপ করিয়া তাহার নিজের ঘরের মধ্যে বসিয়া বাটীর অপর খণ্ডের গতিবিধি শব্দ-সাড়া শুনিতে লাগিল। ইতিপূর্বে তাহার যে অত্যন্ত ক্ষুধা

বোধ হইয়াছিল, এখন সে কথাও ভুলিয়া গেল। রাত্রি তখন বোধ হয় নয়টা, সে ঘুরিয়া গিয়া খিড়কির দরজায় পা দিতেই নেত্য কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাম জিজ্ঞাসা করিল, বৌদ কোথায় নেত্য?

ঘরে শুয়ে আছেন।

রাম ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, বৌদি খাটের উপর শুইয়া আছেন. এবং নীচে মাদুর পাতিয়া দিগম্বরী ছোট মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দ খেলা করিতেছিল, ছুটিয়া আসিয়া কাকার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিয়া দিল, কাকা, তোমার বাড়ি ওদিকে, এদিকে আমাদের বাড়ি। বাবা বলেচে তুমি এ ঘরে ঢুকলে পা ভেঙে দেবে।

রাম খাটের উপর নারায়ণীর পায়ের কাছে গিয়া বসিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। রাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিগম্বরী তাঁহার ছোট মেয়েকে ঠেস দিয়া বলিলেন, সুরো বল না, তোর দাদাবাবু কি বলেচে ওকে।

সুরধনী মুখস্থের মত গড় গড় করিয়া বলিয়া গেল—দাদাবাবু বলেছে তুমি এখানে এসো না। কাল সকালে সব—কি মা?

দিগম্বরী বলিলেন, বিসয়-সম্পত্তি।

সুরধনী বলিল, বিষয়-সম্পত্তি কাল ভাগ বাঁটরা করে দেবে।

দিগম্বরী বলিলেন, দিব্যি দেবার কথাটা বল না—ন্যাকা মেয়ে!

সুরধনী বলিল, দাদাবাবু দিব্যি দিয়েছেন দিদিকে—খেতেও দেবে না, কথাও বল্‌বে না—বল্‌লে দাদাবাবু—

নারায়ণী বিছানার উপর হইতে ধমক দিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে. তুই চুপ কর।

তখন দিগম্বরী বলিলেন, তা সত্যি বাছা! তুমি মানুষ জনকে আধ-খুন করে ফেলবে—সে দিব্যি না দিয়ে আর করে কি! আমি

ত বাপু, কিছুতে তার দোষ দিতে পারব না—তা যে যাই বলুক! এ বাড়িতে তোমার আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া আর চলবে না! ওকে সোওয়ামীর মাথার দিব্যিটা ত মানতে হবে?

সুরধনী বলিল, মা, ভাত দেবে, চল না।

দিগম্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সবুর কর বাছা!

রাম তখনও বসিয়া আছে; এমন অবস্থায় ঘরে দোরে আগুন ধরিয়া গেলেও ত তিনি উঠিতে পারেন না। রামের বুকের ভিতর চাপা কান্না মাথা খুঁড়িতে লাগিল, কিন্তু দিগম্বরীর সেই সকালবেলার খোনা কথার ভ্যাংচানি তাহার বুকের উপর পাথর চাপাইয়া পথ আট্‌কাইয়া রাখিল। একবার সে কাঁদিতে পারিল না, একবার বলিতে পারিল না, 'আর করব না বৌদি'! এই একটা কথা অনেক আপদ বিপদেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে—আজ তাহাই বলিতে না পাইয়া তাহার দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় নারায়ণী ক্লান্তভাবে বলিলেন, সুরো, যেতে বল ওকে।

এবার সে কান্না চাপিয়া বলিল, যেতে বল ওকে! আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? সেই ত কখন খেয়েছি?

নারায়ণী একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, একেবারে খুন করে ফেলতে পারেনি? তা হলে দশ হাতে খেতো! আমি জানিনে—যাক্ ও নেত্যর কাছে।

যাব না নেত্যর কাছে! আমি কারো কাছে যাব না—আমি না খেয়ে উপোস করে শুয়ে থাক্‌ব। বলিতে বলিতে রাম দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া বাড়ী ঘর কাঁপাইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইল। নেত্য কিছু খাবার আনিয়া বলিল, ছোট বাবু, ওঠ, খাও।

রাম লাফাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল, দূর হ, পোড়ারমুখী—দূর হ!

নেত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, রাম থালা-গেলাস ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠানের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

সকালবেলা শ্যামলাল কাজে চলিয়া যাইবার পরে, রাম নিজের উঠানে পায়চারি করিতে করিতে গর্জাইতে লাগিল—আমি দিব্যি মানিনে ওঃ ভারি দিব্যি! ও কে যে দিব্যি দেয়? ও কি আমার আপনার দাদা? ও কেউ নয়, ওর কথা আমি মানিনে। আমি কি ওকে মেরেচি! বুড়ি ডাইনিকে মেরেছি! ও ত শুধু বৌদিকে লেগেছে, তবে ওরা কেন দিব্যি দিতে আসে?

এ সকল কথার কেহই জবাব দিল না। খানিক পরে সে সুর বদলাইয়া বলিতে লাগিল, বেশ ত! ভালই ত! না-ই কথা কইলে, না-ই খেতে দিলে। আমি মজা করে রাঁধব—ভাত, ডাল, ভাল ভাল তরকারি, মাছ—একলা বেশ পেট ভ'রে খাব। আমার কি হবে?

এ কথারও কেহ জবাব দিল না। তখন সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে থালা, ঘটি বাটি নাড়িয়া-চাড়িয়া কাজ করিতে লাগিল। হাঁক-ডাক করিয়া ভোলাকে চাল ডাল ধুইয়া আনিতে, তরকারি কুটিতে আদেশ দিল। সমস্ত নেত্য রান্নাঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। ভোলাকে হুকুম করিল, তুই আমার চাকর ও বাড়ি যাস্‌নে। ও বাড়ির কেউ যদি এদিকে আসে, তার পা ভেঙে দিবি—বুঝলি ভোলা, নেত্য আসুক একবার এদিকে।

নারায়ণী রান্নাঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। দিগম্বরী কৌতুহলী হইয়া মাঝে মাঝে বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতেছিলেন। খানিক পরে বড় মেয়ের কাছে উঠিয়া আসিয়া হাসি চাপিয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা, বাছার কি বুদ্ধি! উনি আবার ভাল ভাল তরকারি রেঁধে খাবেন। একটা পেতলের হাঁড়িতে প্রায় এক কাঠা চাল গলায় গলায় তুলে

দিয়ে রান্না চড়িয়েচে—তাতে জল দিয়েচে এক ফোঁটা। একজন খাবে ত, রাঁধচে দশজনের। তাই বা সেদ্ধ হবে কি করে ? পুড়ে আঙ উঠবে যে! ঐ হাঁড়িতে কি অত চাল ধরে, ঐটুকু দেলের কর্ম! আবার রাঁধিয়ে বলে দেমাক আছে! রাঁধি বটে আমরা, কিন্তু দেমাক কত্তে জানিনে! ভাত রাঁধব. তা এমন জল দেব, আর দেখতে হবে না—চোখ বুজে সেদ্ধ হবে। কই রাঁধুক দিকি আমার সঙ্গে ? লোক খেয়ে কারটা ভাল বলে দেখি ?

নারায়ণী মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

নেত্য কাছে ছিল, সে বলিল, দিদিমার এক কথা। ও কি কোনদিন এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়েছে যে, আজ রেঁধে খাবে ?

সে অনেক দিনের দাসী, এসব ব্যাপার তাহার ভাল লাগতেছিল না।

মায়ের দেখাদেখি সুরধনীও মাঝে মাঝে গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিতোছিল। ঘণ্টাখানেক পরে ছুটিয়া আসিয়া দিদির হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—ও দিদি. দেখবে এস, রামদাদা—মা গো! একেবারে কাঁচা ভাতগুলো শুধু খাচ্ছে। কিছু নেই দিদি—একেবারে শুধু ভাত। আচ্ছা, দিদি, কাঁচা ভাতে পেট কামড়াবে না ?

নারায়ণী তাহার হাত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন। সে কত বড় দুঃখ, কত বড় ক্ষুধার তাড়নে এইগুলা খাইতে বসিয়াছে, সে কথা তাঁহার অগোচর রহিল না।

দুপুর-বেলা শ্যামলালের খাওয়া হইয়া গেল, দিগম্বরী ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, যা পারিস, দুটি খেয়ে নে নারাণি! ওর তাড়নে জ্বরের মত হয়েছে—ওতে খাওয়া চলে। আমি বল্‌চি, ক্ষতি হবে না।

নারায়ণী মোটা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ভাল করিয়া শুইয়া বলিলেন, আমাকে বিরক্ত ক'রো না মা. তোমরা খাও গে।

দিগম্বরী বলিলেন, ভাত না খাস্, দুখানা রুটি করে দি—না হয়—

নারায়ণী কহিলেন, না, কিচ্ছু না।

দিগম্বরী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ও আবার কি কথা, কাল থেকে উপোস করে আছিস্, আজ দুটি না খেলে হবে কেন ?

নারায়ণী জবাব দিলেন না। নেত্য আসিয়া বলিল, তুমি মিথ্যে বকে মর্‌চ দিদিমা। ঐখানে দাঁড়িয়ে এক বেলা চেঁচালেও ওঁকে খাওয়াতে পারবে না। জ্বর হয়েচে, একটু ঘুমোতে দাও।

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন, বলিতে বলিতে গেলেন, জানিনে বাপু, নাগ্‌লে-টাগ্‌লে একটু জ্বরভাব হয়, তাই বলে কি মানুষ উপোস করে পড়ে থাকে ? আমরা ত পারিনে।

বৈকালে নারায়ণী আবার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন এবং যতবার নেত্যর চোখে চোখে হইল, ততবারই কি বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন।

রাম স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া আনিল। খাইতে খাইতে গলা বড় করিয়া বলিল, কি আর ক্ষতি হল আমার ? ভাত খেয়ে ইস্কুলে গেলুম, আবার ফিরে এসে কেমন খাচ্চি।

বেড়ার ওদিকে সকলেই রহিয়াছে, তাহা সে বুঝিল, কিন্তু সকালের মত এখনও কেহ জবাব দেয় না দেখিয়া সে আরও অস্থির হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, এই দিকটা আমার সীমানা। কোন দিন নেত্য কি কেউ যদি আমার সীমানায় আসে, তখন পা ভেঙে দেব।

এই পা ভাঙার ভয় ইতিপূর্বে দেখাইয়াছিল, সেবারেও যেমন ফল হয় নাই এবারও হইল না। কেহ ভয় পাইয়াছে কি না বোঝা গেল না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া সে রান্নাঘরে ঢুকিয়া আবার

চেঁচামেচি করিতে লাগিল, আমার কাঠ কই ? আমি রাঁধব কি দিয়ে ? আমার শিল-নোড়া কই, আমি বাটন-বাটব কিসে ? ও-ঘর হইতে নেত্য বলিল, মা, বলচেন, কাল শিল-নোড়া কিনে দেবেন।

না, আমি কেনা শিল-নোড়া চাইনে। বলিয়া সে কাঁদিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন আমার গণেশকে ধরলে ? কেন আমাকে খোনা খোনা করে বুড়ী ভেঙালে, বেশ করেছি, গাল দিয়েছি—ও মরে আর জন্মে পেত্নী হবে।

দিগম্বরী চোখ কট্‌মট্‌ করিয়া বলিলেন, শুন্‌লি নারাণি, শুন্‌লি ? এ সমস্ত পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করা নয় ?

নারায়ণী চুপ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

॥ ৫ ॥

পরদিন সকাল হইতে রামের কথবার্তা বদ্‌লাইয়া গেল। সম্পূর্ণ দুইটা দিন কাটিয়া গিয়াছে, বৌদিদি ডাকে নাই, বকে নাই, খাইতে দেয় নাই, এ রকম সে তাহার জ্ঞানে দেখে নাই। আজ সে বাস্তবিক ভয় পাইয়াছিল। প্রথমটা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া সে নানারূপ উল্টাপাল্টা জবাবদিহি করিল। একবার বলিল, বেড়াল মারিতে পেয়রা ছুড়িয়াছিল ; একবার বলিল, হাত ফস্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়া বৌদিদির কপালে লাগিয়াছিল। একবার বলিল, কাঁচা পেয়ারা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিল। তারপর একবার বলিল, কাহাকেও সে গাল দেয় নাই ; একবার বলিল, গোবিন্দকে দিয়াছিল ; একবার বলিল, ভোলাকে দিয়াছিল ; কিন্তু কোন

কৈফিয়তেই কাজ হইল না। ওঘরের কেহ জবাব দিল না, 'হাঁ না' একটা কথাও বলিল না। একবার বহু কষ্টে লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া 'আর কোন দিন করব না' বলিয়া ফেলিয়াও যখন হইল না, তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি উপায়ে কি দিয়া কেমন করিয়া সে বৌদিদিকে প্রসন্ন করিবে? বৌদিদি তাহাকে আলাদা করিয়া দিয়াছে, তবে কোথায় সে যাইবে? কাহার কাছে কেমন করিয়া সে থাকিবে? কোন দিকেই আজ সে কুল-কিনারা দেখিতে পাইল না। আজ সে রাধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতেও গেল না, ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল।

গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি, গত রাত্রে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল। দুপুর-বেলা দিগম্বরী এক বাটি দুধ আনিয়া বলিলেন, খেতেই হবে। না খেয়ে কি মরবি? নারায়ণী প্রতিবাদ না করিয়া দুধের বাটী হাতে লইয়া কতকটা খাইয়া বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার 'না' 'না' করিয়া কথা কাটাকাটি করিতে ঘৃণা বোধ হইল।

রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন নেত্য আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, ছোটবাবুর ত কোন সাড়া-শব্দ পাইনে—রাত ত ঢের হল।

নারায়ণী উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয় সে ঘরে আছে কি না?

নেত্যর চোখ ভিজিয়া উঠিল। হাত দিয়া দুই চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার যেতে সাহস হয় না মা! বলিয়া বাহিরে গিয়া ভোলাকে ডাকিয়া আনিল। ভোলা সংবাদ দিল—দাঠাকুর ঘরে আছে, ঘুমুচ্ছে।

নারায়ণী নিঃশব্দে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া

চাদর মুড়ি দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাত না হইতেই তিনি স্নান করিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন।

রান্না যখন প্রায় অর্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, তখন দিগম্বরী গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কর্কশ-স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোর না জ্বর নারাণি? তুই না তিন দিন খাস্ নি? ভোর-বেলা উঠে চান করে এসে এ সব কি হচ্ছে, জিজ্ঞেস করি?

নারায়ণী স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, রাধঁচি, দেখতে ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি, কিন্তু কেন? কেন শুনি? তুই কি আমার হাতে খাবি নি?

নারায়ণী জবাব দিলেন না, কাজ করিতে লাগিলেন।

কাল সমস্ত দিন ধরিয়া রাম এই কথা ভাবিতেছিল—বৌদির না জানি কত লাগিয়াছে। একটা কাঁচা পেয়ারা লইয়া বার বার কপালের উপর ঠুকিয়া সে আঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে ভাবিতে বসিয়াছিল, কি করিলে এই কুকর্মটা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল, কিছুদিন পূর্বে বৌদি তাহাকে এইস্থানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শেষে স্থির করিল, সে আর কোথাও গেলে, বৌদি খুশী হইবে। তাহার মামার বাড়ি তারকেশ্বরের ওদিকে, অথচ কোথায় সে ঠিক জানে না। সেইখানে গিয়া খুঁজিয়া লইবে, সঙ্কল্প করিয়া সে একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া প্রভাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

নারায়ণী রান্না শেষ করিয়া একখানি থালায় সমস্ত দ্রব্য পরিপাটি করিয়া সাজাইতেছিলেন। দ্বারের কাছে ভোলা আসিয়া ডাকিল, মা।

নারায়ণী ফিরিয়া ভোলাকে দেখিয়া বলিলেন, কিরে ভোলা?

এ কয়টা দিন সে বাহিরে গরুর সেবা করিত বটে, কিন্তু রামের

ভয়ে ভিতরে আসিত না। ভোলা আস্তে আস্তে বলিল, চুপি চুপি একটা কথা আছে মা।

নারায়ণী কাছে আসিতেই ভোলা ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল, তুমি যা বলেছিলে মা, তাই হয়, যদি দুটি টাকা দাও।

নারায়ণী বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, কি হয় রে? কাকে টাকা দিতে হবে?

ভোলা একটুখানি আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি দাঠাকুরকে চলে যেতে বলেছিলে না? তিনি যেতে রাজী আছেন—আচ্ছা, দুটো না দাও, একটি টাকা দাও।

নারায়ণী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, কোথায় যেতে রাজী আছে রে? কোথায় সে?

ভোলা বলিল, বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার থানের ওদিকে কোথায় তেনার মামার বাড়ী আছে যে!

যা ভোলা, শীগ্‌গির ডেকে আন্—বল্ আমি ডাক্‌চি।

ভোলা ছুটিয়া চলিয়া গেল, নারায়ণী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনতিকাল পরে রাম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই, নারায়ণী নিঃশব্দে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

দূর হইতে দিগম্বরী রামকে রন্নাঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন সাজানো থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর, আর এক জনের অশ্রু বৃষ্টিধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে; অবাক হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, ওঃ—তাই এত রান্না? খাওয়ান হবে বুঝি? আমার জামাই যে এত বড় দিব্যিটা

দিলেন, সেটা ভেসে গেল বুঝি ?

নারায়ণী মুখ তুলিয়া বলিলেন, ভেসে যাবে কেন মা, তাঁর কথা আমি অমান্য করিনি, তিন দিন খাইনি, খেতেও দিইনি।

দিগম্‌বরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই বুঝি অমান্য করিস্‌নি, তবে এ কি হচ্চে ? যে দিব্যি দিয়েচে তার বুঝি হুকুমটাও নিতে হবে না ?

নারায়ণী কি যেন একটা কঠিন আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, আমার হুকুম নেওয়া হয়েছে।

দিগম্‌বরী বিশ্বাস করিলেন না। অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন আমি কচি খুকী নই, নরাণি। হুকুম নিলি আর আমি জান্তেও পায়লুম না ?

এবার নারায়ণীর আর সহ্য ইইল না। তিনি কঠিন হইয়া বলিলেন, তুমি কি জান্‌বে মা ? কার কাছে কখন হুকুম পেয়েচি মা, যার মুখ আছে, সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু—বলিয়া তিনি গভীর স্নেহে রামের লজ্জিত মুখ জোর করিয়া বুকের ভিতর হইতে তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে চুম্‌বন করিয়া বলিলেন, কিন্তু যাকে বুকে করে এতটুকুকে বড় করে তুলতে হয়, সে-ই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন করে আসে। তোমাকে ভাব্‌তে হবে না; এখন একটু সামনে থেকে যাও, দুটো খাইয়ে দিই। এ আমার তিন দিন অনাহারে আছে। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের জল আবার ঝরিয়া পড়িতে লগিল।

দিগম্‌বরী একমুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, এখানে তবে আর আমার কি করে থাকা হবে ? এ বাড়ীতে আর থাকতে পারব না তা তোকে আজ স্পষ্ট বল্‌লুম।

নারায়নী বলিলেন, আমিও এই কথাটাই তোমাকে মুখ ফুটে বলতে পারছিলাম না মা, সত্যি তোমার এখানে থাকা হবে না।

তোমার চোখে চোখে আমার এত বড় ছেলে যেন আধখান হয়ে গেছে। ও দুষ্ট হোক যা হোক আমার বাড়িতে আমার চোখের সামনে একে শাস্তি দিতে আমি কাউকে দেব না। আজ তুমি থাক, কাল কিন্তু বাড়ি যেয়ো। তোমার খরচপত্র আমি সমস্ত পাঠিয়ে দেব, কিন্তু এখানে তোমার আর থাকা হবে না।

দিগম্বরী কাঠ হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রাম বুকের ভিতর হইতে আস্তে আস্তে বলিল, না বৌদি, উনি থাকুন, আমি ভাল হয়েছি, আমার সুমতি হয়েছে—আর একটি বার তুমি দেখ।

নারায়ণী আর একবার তাহার মুখ ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই এখন ভাত খা।

বাল্য স্মৃতি

॥ ১ ॥

অন্নপ্রাশনের সময় যখন আমাদের নামকরণ হয় তখন আমি ঠিক হইয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়াই হৌক আর ঠাকুর্দা মহাশয়ের জোতিষ-শাস্ত্রে বিশেষ দখল না থাকাতেই হৌক, আমি 'সুকুমার'। অধিক দিন নহে, ঠিক দুই-চারি বৎসরে ঠাকুর্দা মহাশয় বুঝিলেন যে, নামটার সহিত আমার তেমন মিশ খায় না। এখন বার তের বৎসর পরের কথা বলি। অবশ্য আমার আত্মপরিচয়ের কথা কেউ ভাল বুঝিতে পারিবে না—তবুও—

দেখুন, পাড়াগাঁয়ে আমাদের বাড়ী। সেখানে আমি ছেলে-বেলা হইতেই আছি। পিতা মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। আমি বড় একটা সেখানে যাইতাম না। ঠাকুরমার নিকট দেশেই থাকিতাম। বাটীতে আমার উপদ্রবের সীমা ছিল না। এক কথায় একটি ক্ষুদ্র রাবণ ছিলাম। বৃদ্ধ ঠাকুর্দা যখন বলিতেন, তুই হ'লি কি? কারও কথা শুনিস্‌নে। এইবার তোর বাপ্‌কে চিঠি লিখ্‌ব। আমি অল্প হাসিয়া বলিতাম, ঠাকুর্দ; সে দিন কাল আর নেই, বাপের বাপকে আমি ভয় করিনে। ঠাকুরমা কাছে থাকিলে আর ভয় কি? ঠাকুর্দাকে তিনিই বলিতেন, কেমন উত্তর দিয়েছে—মার লাগ্‌বে ?

ঠাকুর্দা মহাশয় যদি বড় বিরক্ত হইয়া আমার পিতাকে পত্র লিখিতেন, আমি তখন তাঁর আফিমের কৌটা লুকাইয়া ফেলিতাম, পরে পত্রখানি না ছিড়িয়া ফেলিলে আর কৌটা বাহির করিতাম না। এই সকল উপদ্রবের ভয়ে বিশেষতঃ মৌতাত সম্বন্ধে বিভ্রাট ঘটে দেখিয়া তিনি আমাকে আর কিছু বলিতেন না। আমিও বেশ ছিলাম।

হইলে কি হয়? সকল সুখেরই একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। আমারও তাহাই হইল। ঠাকুর্দার খুড়তুত ভাই গোবিন্দবাবু বরাবর এলাহাবাদে চাকুরী করিতেন; এখন পেন্‌সন্‌ লইয়া তিনি দেশে আসিলেন। তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বি-এ পাশ করিয়া তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁকে সেজদাদা বলি। পূর্বে আমার সহিত তাঁহার

বিশেষ জানাশুনা ছিল না। তিনি বড় একটা এ অঞ্চলে আসিতেন না ; বিশেষতঃ তাঁদের আলাদা বাড়ী ; আসিলেও আমার বিশেষ খোজ লইতেন না। কখনও দেখা হইলে—কি রে কেমন আছিস ? কি পড়িস ? এই পর্যন্ত।

এবার তিনি জাকিয়া আসিয়া দেশে বসিলেন। কাজে কাজেই আমার বিশেষ খোঁজ হইল। দুই-চারি দিবসের আলাপেই তিনি আমাকে এরূপ বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই আমার ভয় হইত, মুখ শুকাইয়া যাইত, বুক ধড়াস্, ধড়াস্ করিত—যেন কত দোষই করিয়াছি, কত শাস্তি পাইব। আর যথার্থ আমি তখন প্রায়ই দোষী থাকিতাম। সর্বদা একটা না একটা অন্যায় করা আমার চাই। দুই-চারিটা অকর্ম দুই-চারি বার উপদ্রব করা আমার নিত্যকর্ম। ভয় করিলেও আমি দাদাকে বড় ভালবাসিতাম। ভাই ভাইকে যে এত ভালবাসিতে পারে, পূর্বে আমি তা জানিতাম না। তিনিও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁর কাছেও কত দোষ করিয়াছি, কিন্তু কিছু বলিতেন না ; আর বলিলেও মনে করিতাম, সেজদাদা ত, একটু পরে আর কিছুই মনে থাকিবে না।

ইচ্ছা করিলে হয়ত তিনি আমার চরিত্র সংশোধন করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। তাঁর দেশে আসাতে আমি পূর্বের মত স্বাধীন নয় বটে কিন্তু তথাপি যাহা আছি, বেশ আছি।

রোজ ঠাকুর্দার এক পয়সার তামাক খাইয়া ফেলি। বুড়ো বেচারী আমার ভয়ে খাটের খুরোর পাশে, তক্তপোশের পেটের সিন্দুকে, চালার বাতায়, যেখানে তামাক রাখিতেন, আমি খুঁজিয়া খুঁজিয়া সবটুকু টানিয়া আনিয়া খাইয়া ফেলিতাম। খাই দাই ঘুড়ি ওড়াই, বেশ আছি। কোনও জঞ্জাল নাই ; পড়াশুনা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। পাখী মারিতাম, কাঠবেড়াল মারিয়া পোড়াইয়া খাইতাম, বনে বনে গর্তে গর্তে খরগোস খুঁজিয়া বেড়াইতাম, কোনও ভাবনা ছিল না।

বাবা বক্সারে চাকুরী করিতেন। সে স্থান হইতে আমাকে দেখিতেও আসিতেন না ; মারিতেও আসিতেন না। ঠাকুরমা ও ঠাকুর্দার হাল পূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। সুতরাং এক কথায় আমি বেশ ছিলাম।

একদিন দুপুর-বেলা বাড়ী আসিয়া ঠাকুরমার নিকট শুনিলাম, আমাকে সেজদার সহিত কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে। আহারাদি সমাপ্ত করিয়া এক ছিলিম তামাক হাতে করিয়া আসিয়া ঠাকুর্দাকে বলিলাম, আমাকে কলকাতায় যেতে হবে? ঠাকুর্দা বলিলেন, হাঁ। আমি পুর্ব হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, এ সকল ঠাকুর্দার চালাকি। বলিলাম, যদি যেতে হয় আজই যাব! ঠাকুর্দা হাসিয়া বলিলেন, সে জন্য চিন্তা কি দাদা? রজনী আজই কলকাতায় যাবে। বাসা ঠিক হয়ে গেছে আজই যেতে হবে। আমি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলাম। একে সেদিন ঠাকুর্দার তামাক খুঁজিয়া পাই নাই—যে এক ছিলিম পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমার একটানও হইবে না—তাহার উপর আবার এই কথা। ঠকিয়া গিয়াছি; নিজে নিমন্ত্রণ লইয়া আর ফিরান যায় না। কাজেই সেদিন আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইল। যাইবার সময় ঠাকুর্দাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম, হরি, কালই যেন তোমার শ্রাদ্ধে বাড়ী ফিরে আসি। তারপর আমাকে কে কলকাতায় পাঠায় দেখে নেব।

॥ ২ ॥

আমি এই প্রথম কলিকাতায় আসিলাম। এত বড় জমকাল শহর পূর্বে কখনও দেখি নাই। মনে ভাবিলাম, যদি এই প্রকাণ্ড গঙ্গার উপরের কাঠের সাঁকোর মাঝামাঝি, কিংবা ঐ যেখানে একরাশ মাস্তুল খাড়া করিয়া জাহাজগুলা দাঁড়াইয়া আছে, সেই বরাবর যদি একবার তলাইয়া যাই, তাহা হইলে আর কখনও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিব না। কলিকাতায় আমার একটুও ভাল লাগিল না। এত ভয়ে কি আর ভালবাসা হয়? কখনও যে হইবে—সে ভরসাও করিতে পারিলাম না।

কোথায় গেল আমাদের সেই নদীর ধার, সেই বাঁশঝাড়, মাঠের মধ্যের বেলগাছ, মিত্তিরদের বাগানের এক কোণের জামরুল গাছ, কিছু,নাই।

শুধু বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী-ঘোড়া, আর লোকজনে ঠেসাঠেসি পেষাপেষি, বড় বড় রাস্তা—বাড়ীর পিছনে এমন একটি বাগান নাই যে, লুকাইয়া এক ছিলিম তামাক খাই। আমার কান্না আসিল। চোখের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলাম ভগবান জীবন দিয়েছেন – আহার তিনিই দেবেন। কলিকাতায় স্কুলে ভর্তি হইয়াছি, ভাল করিয়া পড়াশুনা করি, কাজে কাজেই আমি আজকাল ভাল ছেলে। দেশে অবশ্যই আমার নাম জাহির হইয়া গিয়াছে—যাক সে কথা।

আমরা আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া একটা মেস করিয়া আছি। আমাদের মেসে চারিজন লোক। সেজদাদা, আমি, রামবাবু, ও জগন্নাথবাবু। রামবাবু ও জগন্নাথবাবু সেজদাদার বন্ধু। এতদ্ভিন্ন একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ আছে।

গদাধর আমাদের রসুয়ে ব্রাহ্মণ। সে আমার অপেক্ষা তিন-চারি বৎসরের বড় ছিল। অমন ভালমানুষ লোক আমি কখনও দেখি নাই। পাড়ার কোনও ছেলের সহিত আমার আলাপ ছিল না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইলেও সে আমার মস্ত বন্ধু হইয়া উঠিল। তাহাতে আমাতে যে কত গল্প হইত তাহার আর ঠিকানা ছিল না। তাহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলার একটা গ্রামে। সেখানকার কথা, তাহার বাল্য-ইতিহাস ইত্যাদি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত! সে সব কথা আমি এতবার শুনিয়াছি যে, আমার বোধ হয় আমাকে সেখানে চোখ বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলেও সমস্ত স্থানটি স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি। রবিবারে তাহার সহিত আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে আসিতাম। সন্ধ্যা বেলা রান্নাঘরে বসিয়া খিল দিয়া দুইজনে বিন্তি খেলিতাম। ভাত খাইয়া তার ছোট হুঁকোটিতে দুইজনে তামুক খাইতাম। সব কাজ আমরা দুইজনে করিতাম। পাড়ার কাহারও সহিত আলাপ নাই; সঙ্গী, দোস্ত, ইয়ার, বন্ধু, মুচিপাড়ার ভুলো, কেলো, খোকা, খাঁদা সবই আমার সে; তাহার মুখে আমি কখনও উঁচু কথা শুনি নাই। মিছামিছি সবাই তাহাকে তিরস্কার করিত; আমার গা জ্বালা করিত, কিন্তু সে কোনও কথায় উত্তর দিত না—যেন যথার্থই দোষ করিয়াছে।

সকলকে আহার করাইয়া সে যখন রান্নাঘরের কোণে একটি ছোট থালায় খাইতে বসিত, তখন আমার শতকর্ম থাকিলেও সেখানে উপস্থিত হইতাম। বেচারীর ভাগ্যে প্রায় কিছুই থাকিত না; এমন কি ভাত পর্যন্ত কম পড়িত। কাহারও খাইবার সময় আমি থাকি নাই—খাইতে বসিয়া ভাত কম পড়ে, তরকারী কম পড়ে, মাছ কম পড়ে, আমি আগে কখনও দেখি নাই। আমার কেমন কেমন বোধ হইত।

ছেলে-বেলায় ঠাকুরম' মধ্যে মধ্যে দুঃখ করিয়া বলিতেন, ছোলটা আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে—আর বাঁচবে না। আমি কিন্তু ঠাকুরমার ভোরপেট কিছুতেই খাইতে পারিতাম না। শুকাইয়াই যাই, আর দড়ি হইয়াই যাই, আমার আধপেটাই ভাল লাগিত। এখন কলিকাতায় আসিয়া বুঝিয়াছি, সে আধপেটায় এ অধেপেটায় অনেক প্রভেদ। কেহ খাইতে না পাইলে যে চোখে জল আসিয়া পড়ে, আমি পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই। পূর্বে কতবার ঠাকুর্দার পাত্রে উৎস্থষ্ট জল দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে দিই নাই; ঠাকুবমার গায়ে সারমেয় সন্তান নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উপস্থিত কর্ম হইতে তাঁহাকে বিরত করিয়াছি। তাঁহাদের আহার হয় নাই; কিন্তু চোখে কখনও জল আসে নাই। পিতামহ, পিতামহী আপনার লোক—গুরুজন, আমাকে স্নেহ করেন—তাঁহাদের জন্য কখনও দুঃখ হয় নাই; স্বইচ্ছায় তাঁহাদিগকে অর্ধভুক্ত, এমন কি অভুক্ত রাখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আর এই গদাধর কোথাকার কে—তাহার জন্য অনাহূত অশ্রু আপনি আপনি আসিয়া পড়ে।

কলিকাতায় আসিয়া যে আমার কি হইল, তাহা ঠাওরাইতে পারি না। চোখে এত জলই বা কোথা হইতে আসে, ভাবিয়া পাই না। আমাকে কেহ কাঁদিতে দেখে নাই। জিদ করিয়া অস্ত খেজুরের ছড়ি আমার পৃষ্ঠে ভগ্ন করিয়াও বাল্যকালে গুরুমহাশয় তাঁহার সাধ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ছেলেরা বলিত, সুকুমারের গা ঠিক পাথরের মত। আমি মনে মনে বলিতাম, গা পাথরের মত নয়—মন পাথরের মত। কচি খোকার মত কাঁদিয়া ফেলি না। বাস্তবিক কাঁদিতে আমার লজ্জা বোধ হইত, এখনও হয়; কিন্তু সামলাইতে পারি না। লুকাইয়া কেহ কোথাও নাই

দেখিয়া, চোরের চুরি করার মত—দুবার চক্ষু মুছিয়া ফেলি। স্কুলে পড়িতে যাই, একপাল লোক ভিক্ষা করিতেছে। কাহারও হাত নাই, কাহারও পা নাই, কাহারও চক্ষু দুটি নাই, এমনই কত কি নাই ধরনের লোক দেখি, তাহা আর বলিতে পারি না। তিলক কাটিয়া খঞ্জনী হাতে লইয়া "জয়-রাধে" বলিয়া ভিক্ষা করে তাহাই জানি, এসব ভিখারী আবার কি রকমের? মনের দুঃখে মনে মনেই বলিতাম, ঠাকুর! এদের আমাদের দেশে পাঠিয়ে দাও? যাক্ পোড়া ভিখারীর কথা—আমার কথা বলি। চক্ষু অনেকটা সড়গড় হইলেও আমি একেবারে বিদ্যাসাগর হইতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের মা সরস্বতী যে কোথা হইতে আসিয়া আমার স্কন্ধদেশে ভর করিতেন, বলিতে পারি না। তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া যে সকল সৎকর্ম করিয়া ফেলিতাম, তজ্জন্য এখনও আমার সে সরস্বতীর উপর ঘৃণা হইয়া আছে। বাসায় কাহার কি অনিষ্ট করিব, সর্বদা খুঁজিয়া বেড়াইতাম। রামবাবু তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাহার দেশী কালাপেড়ে কাপড় কুঞ্চিত করিলেন; বিকালে বেড়াইতে যাইবেন; আমি অবসর বুঝিয়া কাপড়খানি খুলিয়া টানিয়া প্রায় সোজা করিয়া রাখিয়া দিলাম। তিনি বিকালে বস্ত্রখানির অবস্থা দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার আর আমোদ ধরে না। জগন্নাথবাবুর অফিসের বেলা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি আহার করিতে বসিয়াছেন, এক মুহূর্ত বিলম্ব সহিতেছে না। আমি সময় বুঝিয়া তাঁহার চাপকানের বোতামগুলি সমস্ত কাটিয়া লইলাম। স্কুল যাইবার সময় একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গেলাম, জগন্নাথবাবু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেছেন। মনের আনন্দে আমি সমস্ত পথ হাসিতে হাসিতে চলিলাম, সন্ধ্যার সময় জগন্নাথবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমার চাপকানের বোতামগুলো গদা বেটা চুরি করে বেচে ফেলেছে—বেটাকে তাড়িয়ে দাও। জগন্নাথবাবুর চাপকানের বিবরণে দাদা ও রামবাবু উভয়েই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। সেজদাদা বলিলেন, কত রকমের চোর আছে, কিন্তু চাপকানের বোতাম চুরি করে বেচে ফেল্‌তে কখনও শুনিনি। জগন্নাথবাবু এ কথায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, বেটা বোতামগুলো সকালে নিলে না, বিকালে নিলে না, রাত্রে নিলে না, ঠিক

আফিস যাবার আগেই নিয়েছে। আজ দুর্গতির একশেষ ক'রেছে, একটা কালো ছেঁড়া পিরাণ গায়ে দিয়ে আমায় আফিস যেতে হয়েছে।

সকলেই হাসিলেন। জগন্নাথবাবুও হাসিলেন। কিন্তু আমি হাসিতে পারিলাম না। মনে ভয় হইল, পাছে গদাধরকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সে যে নির্বোধ, হয়ত কোনও কথা বলিবে না, সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইবে।

কে বোতাম লইয়াছে, সেজদাদা হয়ত বুঝিয়াছিলেন। গরীব গদাধরের উপর কোনও জুলুম হইল না। কিন্তু আমিও সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও এমন কর্ম করিয়া অন্যকে বিপন্ন করিব না।

এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি পূর্বে কখনও করি নাই; কখনও করিতাম কি না জানি না; শুধু গদাধর আমাকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে।

কি উপায়ে কাহার যে চরিত্র সংশোধিত হইয়া যায়, কেহই জানে না। গুরুমহাশয়ের, ঠাকুর্দা মহাশয়ের আরও অনেক মহাশয়ের কত চেষ্টাতেও আমি যে-প্রতিজ্ঞা কখনও করি নাই, এক গদাধর ঠাকুরের মুখ মনে করিয়া আজ সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম। এত দিনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছে কি না, জানি না; কিন্তু স্বেচ্ছায় কখনও ভঙ্গ করিয়াছি এমন মনে হয় না।

এখন আর একজন লোকের কথা বলি। সে আমাদের রামা চাকর। রামা জাতে কায়েত কি সৎগোপ, এমনই কি একটা ছিল। বাড়ী কোথায়, শুনি নাই—এত হুশিয়ার চটপটে চাকর সর্বদা দেখা যায় না। আর যদি কখনও দেখা হয়, ইচ্ছা আছে, তাহার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।

সকল কর্মে রামাকে চর্‌কীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিতাম। এই রামা কাপড় কাচিতেছে; তখনই দেখি সেজদাদা স্নানে বসিয়াছেন, সে গা রগড়াইয়া দিতেছে; পরক্ষনেই দেখি সে পান সুপারি লইয়া মহা ব্যস্ত! এইরূপে সে সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়ায়। সেজদার "দি ফেবাওরিট!" মস্ত লোক! আমি কিন্তু তাহাকে দেখিতে পারিতাম না। সে বেটার জন্য আমি সেজদার নিকট প্রায়ই তিরস্কৃত হইতাম। বিশেষতঃ গদা বেচারীকে সে সর্বদাই অপ্রস্তুত করিত। আমি তাহার উপর বড় চটা ছিলাম; কিন্তু হইলে কি হয়, সে সেজদার "দি ফেবাওরিট!"

আমাদের বাসার রামবাবুও তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, দি রোগ!" তখন এ কথাটার ব্যাখ্যা তিনি নিজে না করিতে পারিলেও আমরা দুজনে বিলক্ষণ বুঝিতাম, রামা "দি রোগ!" তাঁহার চটিবার আরও অনেক কারণ ছিল : প্রধান কারণ এই যে, সে নিজেকে রামবাবু বলিয়া পরিচয় করিত। সেজদাদাও সময়ে সময়ে রামবাবু বলিয়া ডাকিতেন। আমাদের রামবাবুর এসব ভাল লাগিত না। যাক বাজে কথা—

একদিন বিকালে সেজদাদা একটা ল্যাম্প ক্রয় করিয়া আনিলেন। বড় ভাল জিনিস, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা মূল্য। সকালে বেড়াইতে যাইতে আমি গদাধরকে ডাকিয়া আনিয়া সেটা দেখাইলাম। গদাধর সে রকম আলো কখনও দেখে নাই। সে মহা আহ্লাদিত হইয়া সেটা দুই চারিবার নাড়িয়া দেখিল : তাহার পর আপনার কর্মে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। আমার কিন্তু কৌতুহল কিছুতেই থামিল না। কি করিয়া চিমনী খুলি! কি করিয়া ভিতরের কল দেখি! অনেক নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, অনেকবার ঘুরাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই খুলিল না। পরে দেখিলাম, নীচে একটা ইসক্রু আছে, অগত্যা সেটা ঘুরাইলাম। কিছুক্ষণ ঘুরাইবার পর হঠাৎ একেবারে ল্যাপের আধখানা খসিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ভাল ধরিতে পারিলাম না, উপরের কাঁচগুলো টেবিল হইতে নীচে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

॥ ২ ॥

সে দিন অনেক রাত্রে আমি বেড়াইয়া আসিলাম। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড হৈহৈ কাণ্ড বাধিয়া উঠিয়াছে : গদাধরকে মাঝখানে লইয়া সকলে গোল হইয়া বসিয়াছেন। সেজদাদা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। গদাধরের জেরা চলিতেছে।

গদাধরের চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। বলিতেছে,

বাবু, আমি ওটা ছুঁয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভাঙ্গিনি, সুকুমারবাবু আমাকে দেখালেন—আমিও দেখলাম। তার পর তিনিও দেড়াতে গেলেন, অমিও রঁধতে গেলাম।

কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সাব্যস্ত হইয়া গেল, সে-ই চিমনী ভাঙ্গিয়াছে। তাহার মহিনা বাকি ছিল; সেই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা দিয়া আবার নূতন চিমনী আসিল। সন্ধার সময় যখন আলো জ্বলিল, তখন সকলেই বেশ প্রফুল্ল হইল, শুধু আমর চক্ষু দুটো জ্বালা করিতে লাগিল। সর্বদা মনে হইতে লাগিল, তাহারা সাড়ে তিন টাকা চুরি করিয়া লইয়াছে। আর থাকিতে পারিলাম না। কাঁদিয়া কোনও মতে সজদাদার মত করিয়া বাড়ী অসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিয়াছিলাম, ঠকুরমার নিকট হইতে টাকা আনিয়া গোপনে সাড়ে তিন টকার পরিবর্তে গদাধরকে সাত টাকা দিব। আমার নিজের কাছে তখন টাকা ছিল না। সব টাকা সেজদাদার নিকট ছিল। কাজেই টাকা আনিতে আমাকে দেশে আসিতে হইল। মনে করিয়া আসিয়াছিলাম এক দিনের অধিক থাকিব না; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সাত-আট দিন দেশে কাটিয় গেল।

সাত-আট দিন পরে আবার কলিকাতার বাসায় ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই ডাকিলাম, গদা। কেহ উত্তর দিল না। আবার ডাকিলাম, গদাধর ঠাকুর! কোনও উত্তর নাই! গদা! এবার রামচরণ আসিয়া বলিল, ছোটবাবু, কখন এলেন?

এই আসছি—ঠকুর কোথায়?

ঠকুর নেই।

কোথায় গেছে?

বাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

তাড়িয়ে দিয়েছেন? কেন?

চুরি ক'রেছিল বলে।

প্রথমে আমি কথাটা ভাল বুঝিতে পারি নাই, তাই কিছুক্ষণ রামার মুখ পানে চহিয়া রহিলাম। রামা আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া

একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিল, ছোটবাবু আশ্চর্য হচ্ছেন, কিন্তু তাকে ত আপনারা চিন্‌তেন না। তাই অত ভালবাসতেন। সে মিট্‌-মিটে ডান ছিল; ভিজে বেড়ালকে আমি চিনতাম।

কিসে সে মিট্‌-মিটে ডাইন ছিল, কিংবা কেন যে সেই সিক্ত মার্জারকে চিনিতে পারি নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কার টাকা চুরি করেছে?

সেজবাবুর।

কোথায় ছিল?

জামার পকেটে।

কত টাকা?

চার টাকা।

কে দেখেছে?

চোখ দিয়ে কেউ দেখেনি বটে, কিন্তু সে একরকম দেখাই।

কেন?

সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করতে হয়? আপনি বাসায় ছিলেন না; রামবাবু নিলেন না: জগন্নাথবাবু নিলেন না; আমি নিলাম না। তবে নিলে কে? কোথায় গেল?

তুই তবে তাকে ধরেছিস?

রামা হাসিয়া বলিল, না হ'লে আর কে?

ঠন্‌ঠনের চটি জুতা আপনারা স্বচ্ছন্দে কিনিতে পারেন। তেমন মজবুত চটি বোধ হয় আর কোথাও প্রস্তুত হয় না।

আমি রন্ধনশালায় গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। সেই ছোট কলি হুঁকাটিতে ধূলা পড়িয়া রহিয়াছে; আজ চার-পাঁচ দিন তাহা কেহ স্পর্শ করে নাই; কেহ জল বদলায় নাই। দেয়ালে একস্থানে কয়লায় লেখা রহিয়াছে, সুকুমারবাবু, আমি চুরি করিয়াছি। এ স্থান হইতে চলিলাম। বাঁচিয়া থাকি আবার আসিব।

আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। নিতান্ত ছেলে-বুদ্ধিতে সেই হুঁকাটিকে বুকে টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কেন যে, তাহার কারণ

বুঝিতে পারি নাই।

আমার আর সে বাসাতে মন টিকিত না। সন্ধ্যার সময় ঘুরিয়া ফিরিয়া একবার করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতাম। আর একজন বাঁধিতেছে দেখিয়া অন্যমনে আপনার ঘরে আসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে বসিতাম। সময়ে সময়ে আমার সেজদাদাকেও দেখিতে পাইতাম না। ভাত পর্যন্ত আমার তিক্ত বোধ হইত। অনেক দিন পরে একদিন রাত্রে সেজদাদাকে বলিলাম, সেজদা! কি করেছ?

কিসের কি করেছি?

গদা তোমার টাকা কখনও চুরি করেনি। সকলেই জানিত আমি গদা ঠাকুরকে বড় বালবাসিতাম।

সেজদাদা বলিলেন, ভাল করিনি সুকুমার। যা হবার হয়েছে, কিন্তু রামাকে তুই অত মেরেছিলি কেন?

বেশ করেছিলাম। আমাকেও কি তাড়াবে নাকি?

দাদা আমার মুখে কখনও অমন কথা শোনেননি। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কত টাকা উসুল হয়েছে?

দাদা বড় দুঃখিত হইয়া বলিলে, ভাল করিনি। সব টাকা তার কেটে নিয়ে আড়াই টাকা উসুল করেছিলাম। আমার অতটা ইচ্ছা ছিল না।

আমি যখন রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম, দূরে যদি কোনও লোক ময়লা চাদর কাঁধে ফেলিয়া ছেঁড়া চটিজুতা পায়ে চলিয়া যাইত, আমি দৌড়াইয়া গিয়া দেখিয়া আসিতাম। কি যে একটা আশা নিত্য নিত্য নিরাশায় পরিণত হইত, তাহা আর কি বলিব?

প্রায় পাঁচ মাস পরে দাদার নামে একটা মনিঅর্ডার আসিল। দেড় টাকার মনিঅর্ডার। দাদাকে আমি সেইদিন চোখের জল মুছিতে দেখি। সে কুপনটা এখনও আমার নিকট রহিয়াছে।

কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও সেই গরীব গদাধর ঠাকুর আমার বুকের আধখানা জড়িয়া বসিয়াছে?

।। সমাপ্ত ।।

0